কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে হলে রমাযানের দাবী পূরণ করতে হবে

হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

মুহিউস-সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর অন্যতম খলীফা, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. কর্তৃক ২৫-০৫-২০১৮ তারিখে খিলগাঁও বাজার জামে মসজিদে প্রদত্ত জুমু'আর বয়ান।

الحمد لله وكفي وسلام علي عباده الذين اصطفي، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم : بسم الله الرحمن الرحيم : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

রমাযানের ফযীলত যথাপন্থায় রোযা পালনকারীদের জন্য

বুযুর্গানে মুহতারাম! কুরআন-হাদীসে রমাযান মাস এবং এ মাসে পালনীয় বিভিন্ন আমলের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্ন হল, এই ফযীলতগুলো কি রমাযানে উপনীত সকল মুসলমান লাভ করবে? কিংবা যেনতেনভাবে রোযা রাখলেই কি এই ফযীলত অর্জিত হবে? না, বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে যে গুণবিশিষ্ট রোযা ও আমল কামনা করেছেন এবং আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে তা পালন করে দেখিয়েছেন, ফযীলত অর্জন করতে হলে আমাদের রোযা ও অন্যান্য আমল যথাসাধ্য সেভাবে আদায় করতে হবে।

এখন জানার বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলা কী কী গুণবিশিষ্ট আমল কামনা করেছেন এবং আল্লাহর হাবীব তা কীভাবে পালন করেছেন। নিয়ত করে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী/স্বামী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। এটা রোযার বাহ্যিক আকৃতি। এটা না হলে রোযা অস্তিত্বেই আসবে না। কিন্তু এই আকৃতির মধ্যে যখন কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আরও কিছু গুণ পাওয়া যাবে, তখন সেটা হবে প্রকৃত রোযা।

ইযযত বেইযযতির মাপকাঠি ঈমানী মৃত্যু

আমরা বারবার শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা রোযার দ্বারা বান্দাদের থেকে তাকওয়ার গুণ কামনা করেছেন। তাকওয়া অবলম্বনের সারমর্ম হল, গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করা। আজ আমাদের থেকে হাসি-মজাকের মাধ্যমেও কত গোনাহ হয়ে যায়! আমরা হাসি-মজাক করে কারও গীবত করে ফেলি। কাউকে ছোট করি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি। অথচ গীবত করা, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা গোনাহে কবীরা ও মারাত্মক পাপ, যা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। উদাহরণত একজন ল্যাংড়াকে 'এই ল্যাংড়া এদিকে আয়!' বলে ডাকা কবীরা গোনাহ। ল্যাংড়া তো আর কেউ ইচ্ছাকৃত হয় না, আল্লাহই কাউকে ল্যাংড়া করে বানান, কাউকে কানা করে বানান। তো আল্লাহ প্রদত্ত এসব সমস্যার কারণে কাউকে তাচ্ছিল্য করা হলে ব্যাপারটি আল্লাহর দিকে গড়ায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা ভীষণ রকম নারায হন। এজন্য হাসি-মজাক করেও কাউকে তাচ্ছিল্য করতে নেই। হতে পারে এই ল্যাংড়া ব্যক্তি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণের তাওফীক পাবে। আর আমি তাচ্ছিল্যকারীর ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক হবে না। নাউযুবিল্লাহ। কার যে কী অবস্থায় মৃত্যু হবে; ঈমানের সাথে, না ঈমানহারা হয়ে–এটা বলার উপায় নেই। তবে ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলে এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কিছু নেই!

অনেকে অভিযোগ করে– হুযূর! অমুকে আমাকে বেইয্যত করেছে। আমি তাকে বলি, আচ্ছা! তোমার যে ইয্যত আছে, এটা তুমি জানলে কীভাবে? ইয্যত হাসিল থাকার পর কেউ যদি তা কমিয়ে দেয়, তবেই না বেইযযত করার প্রশ্ন উঠবে! সুতরাং তোমার যে ইয্যত হাসিল আছে আগে এটা প্রমাণ করো। বস্তুত যখন তুমি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারবে, তখন বোঝা যাবে, তুমি একজন ইয্যতওয়ালা মানুষ। আর সেটা এখনো ঘটেইনি, তাহলে তুমি কিসের ভিত্তিতে নিজেকে ইয্যতওয়ালা দাবী করছো? হ্যাঁ, এটা ভিন্ন কথা যে, দুনিয়াবী দৃষ্টিতে যাকে ইয্যতওয়ালা মনে করা হয়, আমরা তার ইয্যত-সম্মান যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা করবো। কিন্তু নিজেকে নিজে ইয্যতওয়ালা মনে করার তো সুযোগ নেই।

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেছেন, সমস্যা হল– প্রত্যেকে নিজেই নিজের জন্য একটা মূল্য নির্ধারণ করে এবং প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য নির্ধারণ করে। ফলে কেউ সালাম না দিলে অভিযোগ করে যে, 'একটা আস্ত বেয়াদব, আমাকে সালাম দিল না!।' কেন ভাই! সে সালাম দিল না বলে কি আমার পক্ষ হতে সালাম দেয়া নিষেধ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিবিদেরকেও সালাম দিতেন, শিশুদেরকে সালাম দিতেন। একটা কমবয়সী লোক সালাম করেনি বলে সে বেয়াদব হয়ে গেল!? সে না-হয় দেয়নি, আমি কেন দিলাম না?! এখানে সমস্যা এটাই যে, নিজেই নিজের মূল্য নির্ধারণ করেছি এবং বাড়িয়ে নির্ধারণ করেছি।

বলছিলাম, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলে সে দামী মানুষ, ইয্যতওয়ালা মানুষ। ঈমানী মৃত্যুর আগে এর ফায়সালা করার জো নেই।

নিজের ব্যাপারে আমার ধারণা, আমি যেহেতু গেজেটেড অফিসার, বিসিএস ক্যাডার, এফসিপিএস করা ডাক্তার, বুয়েট পাস ইঞ্জিনিয়ার, কাজেই আমি প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। ভেবে দেখা দরকার, সরকারের খাতায় আমি হয়তো প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, কিন্তু আল্লাহর খাতায়ও কি আমার নাম প্রথম শ্রেণীতে আছে? আল্লাহ তা'আলা তো সরকারী খাতা দেখে বিচার করবেন না। অনেক সময় সরকার নিজেই–শরীয়তের খেলাফ দেশ চালানোর কারণে–আল্লাহর খাতায় দুশমনের তালিকাভুক্ত থাকে। তো দুশমনের খাতা দেখে কি আল্লাহ কারও বিচার-আচার করবেন?!

মোটকথা ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়া ইয্যত নির্ণয়ের মাপকাঠি। সুতরাং ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হলে, মানুষের মূল্য অনেক ক্ষেত্রে ফেরেশতারও উর্ধ্বে উঠে যায়। পক্ষান্তরে মৃত্যু যদি ঈমানের সাথে না হয়, তাহলে এমন মানুষের মূল্য শুকর-কুকুরেরও নিচে নেমে যায়। কেননা, শুকর-কুকুরের জাহান্নামে যাওয়া লাগবে না।

রোযার মূল উদ্দেশ্য গোনাহ না করা

তো বলছিলাম, রোযার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা, গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করা। প্রকৃত রোযাদার হতে হলে দিল-দেমাগসহ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোনাহমুক্ত রাখতে হবে। চোখের দ্বারা

কুদৃষ্টি করা যাবে না। কানের দ্বারা গান-বাজনা, গীবত শোনা যাবে না। মুখের দ্বারা মিথ্যা, পরনিন্দা, ফাসেকের প্রশংসা করা যাবে না। কোন ফাসেক তথা কবীরা গোনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তির প্রশংসা করলে আল্লাহ এত নারায হন যে, আরশ কাঁপতে থাকে। অথচ আমরা অহরহ ফাসেকদের প্রশংসা করে থাকি। রাজনৈতিক ময়দানের বড় বড় ফাসেক ব্যক্তিবর্গের কত অবাস্তব প্রশংসা করা হয়। চরিত্রহীনকেও 'ফুলের মত পবিত্র' বলা হয়। আমরা ফাসেকের প্রশংসা করি, আর ফেরেশতারা আমাদের কথার প্রতিবাদ করেন, আল্লাহর আরশে কম্পন সৃষ্টি হয়!

এজন্য রোযা রেখে শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গোনাহর কাজ করব না। হাত দ্বারা মিথ্যা লিখব না, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করব না। পা দ্বারা গোনাহের কাজের দিকে হাঁটব না। দিল-দেমাগ ও চিন্তা-ভাবনা অপরিচ্ছন্ন রাখব না। গোনাহের কাজের কল্পনা-পরিকল্পনা করব না। কাকে কিভাবে নীচু করা যায়, কাকে কিভাবে ঠকানো যায়, কার পকেট কিভাবে কাটা যায়– এ ধরণের কল্পনা-পরিকল্পনা মাথায় আনব না।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. লিখেছেন– জরুরী তো হলো, সারা বছরের জন্য গোনাহমুক্ত জীবন যাপনের হিম্মত করা। যদি সারা বছরের জন্য হিম্মত করতে না পারো, অন্তত রমাযানের জন্য সাহস করো যে, তুমি রমাযানের ত্রিশটি দিন কোন গোনাহ করবে না। হয়তো এই উসীলায় আল্লাহ তোমাকে সারা বছর গোনাহমুক্ত থাকার তাওফীক দিবেন।

এজন্য আমরা রমাযানের শুরুতেই নফসকে বলে দেই– হে দুরাচার! হে পাপিষ্ঠ! তুই আমার খোদা না, আমিও তোর বান্দা না। কাজেই আগামী ত্রিশদিন (পরেরটা পরে দেখা যাবে)- আমি তোর কোন কথা শুনব না, মানব না। এই যে আমি বেঁকে বসলাম, দেখি, তুই আমাকে দিয়ে কীভাবে গোনাহ করাস!

কোন মানুষ যখন গোনাহ না করা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, শয়তানের মোকাবেলায় বেঁকে বসে, তখন আর শয়তান ও নফস তাকে দিয়ে গোনাহ করাতে পারে না। অনেকে প্রশ্ন করে, হুযূর! আল্লাহ না এই মাসে শয়তানকে বেঁধে রেখেছেন তাহলে শয়তান আসবে কোত্থেকে? কথা ঠিক আছে এবং হাদীসেও এসেছে যে, এই মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়, কিন্তু নফস ও প্রবৃত্তি, যেটা সার্বক্ষণিক মানুষের সঙ্গে থাকে, সেটাও কি বেঁধে রাখা হয়? না, বেঁধে রাখা হয় না। আর নফস হল শয়তানের চেয়েও বড় শয়তান। কারণ ইবলিসকে শয়তান বানিয়েছিল তার নফস। ইবলিসকে শয়তান বানানোর জন্য তো অন্য কোন শয়তান ছিল না, তার নফসই তাকে শয়তান বানিয়েছে। মোটকথা শয়তান বেঁধে রাখা হয়েছে, কিন্তু নফসকে বাঁধা হয়নি। এখন আমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারি যে, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে গোনাহ করব না, তাহলে নফসও পরাভূত হবে ইনশাআল্লাহ।

তো রমাযানের ফযীলত পেতে হলে এক নম্বর কর্তব্য হল, গোনাহমুক্ত যিন্দেগী বানানো। নিজের ঘর ও পরিবেশকে বিলকুল গোনাহমুক্ত রাখা। ঘরে শয়তানের বাক্স টেলিভিশনের চিহ্নও না রাখা। যদি এরকম গোনাহমুক্ত যিন্দেগী যাপন করা যায়, তাহলেই রোযার ফযীলত অর্জিত হওয়ার আশা করা যায়। পক্ষান্তরে কেউ রোযাও রাখল, আবার গোনাহও করল। বাকি এগারো মাস যা করেছে, রমাযানেও তা-ই করল, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে– বহু রোযাদার এমন, যারা রোযা রেখে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ছাড়া আর কিছু লাভ করে না। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যারা রোযা রেখে গোনাহ বর্জন করল না, তার খানা-পিনা পরিহার করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আরেক হাদীসে আছে, এমন রোযাদারের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন-তিন বার বদদু'আ করেছেন যে, এই ব্যক্তি ধ্বংস হোক!

যে ব্যক্তি রোযাও পালন করে, গোনাহও জারি রাখে তার উদাহরণ হলো– কেউ শক্তি বর্ধনের জন্য ভিটামিনও সেবন করল, আবার বিষও পান করল। বলুন, ভিটামিন আর বিষ একসাথে খাওয়া হলে কার প্রভাব বিজয়ী হবে? নিঃসন্দেহে বিষ ভিটামিনের উপর বিজয়ী হয়ে পানকারীকে হালাক করে দিবে।

রমাযানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কুরআনে কারীমের সাথে সম্পর্ক কায়েম করা

আল্লাহ তা'আলা রমাযান মাসে আমাদের থেকে দ্বিতীয় যে জিনিসটা চেয়েছেন, তা হল, কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক কায়েম করা। আমি আয়াত পড়েছি–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রমাযান তো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আবার অন্য স্থানে বলা হয়েছে– إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ আমি এই কুরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। আমরা সবাই জানি, লাইলাতুল কদর রমাযান মাসে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআন নাযিল করা হয়েছে বুঝলাম, কিন্তু তার গুণ কী, বৈশিষ্ট্য কী? এর উত্তরে বলা হয়েছে–

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থাৎ, কুরআন পুরো বিশ্বের জন্য হেদায়াত ও পথপ্রদর্শক। কুরআন কোন মামুলী কিতাব না। পুরো বিশ্বের মানুষ–চাই তারা যে কোন কালের এবং যে কোন ভূখণ্ডের অধিবাসী হোক–যদি হেদায়াত চায়, সঠিক রাস্তা পেতে চায়, কল্যাণময় জীবন কামনা করে, এই কুরআন তাকে পথ বাতলে দিবে। লেনিন, কার্ল মার্কস আর মাওসেতুংয়ের বই দ্বারা মানবজাতির হেদায়াত আসবে না। সমাজবাদ-পুঁজিবাদ, ভোগবাদ-বস্তুবাদ আর গণতন্ত্র-প্রজাতন্ত্রের পথে হেঁটে বিশ্ববাসী পথ খুঁজে পাবে না। এসব পথে বিশ্ববাসী যতই হাঁটবে, ততোই পথভ্রষ্ট হতে থাকবে।

আজকাল কেউ কেউ গণতন্ত্র দিয়ে দীন যিন্দা করতে চায়। কিয়ামত এসে গেলেও এটা সম্ভব নয়। এর দ্বারা কেউ পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত দীন কখনই আসবে না। অনেক জায়গায় মসজিদ-মাদরাসার কমিটিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নির্বাচিত হতে দেখা যায়। গণতন্ত্র নিরেট কুফরীতন্ত্র। বলুন, কুফরীতন্ত্র দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা চলবে? আমাদেরকে গণতান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত করা ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র। একশ্রেণীর মুনাফিকের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এর রেওয়ায দেয়া হয়েছে। আফসোস, এখন খালেছ দীনী প্রতিষ্ঠান মসজিদ-মাদরাসায়ও এই কুফরীতন্ত্র প্রবেশ করছে। এখনই সতর্ক না হলে, কুরআনী হেদায়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে সামনে বড় বিপদ আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

কুরআনের অন্যতম তিনটি বৈশিষ্ট্য

যাই হোক, এই আয়াতে কারীমায় কুরআনে তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে–

১. কুরআন ব্যাপকভাবে গোটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য হেদায়াত। কোন অঞ্চল, গোত্র, বর্ণ ও ভাষাভাষীর জন্য নির্দিষ্ট নয়।

২. কুরআন হেদায়াতের উজ্জ্বল প্রমাণ। অর্থাৎ জান্নাতের পথ কেন সঠিক পথ তার যথাযথ প্রমাণ কুরআনে বিদ্যমান। অনুরূপভাবে জাহান্নামের পথ কেন ভ্রষ্টতার পথ তারও যথাযথ প্রমাণ কুরআনে বিদ্যমান।

৩. কুরআনের সত্যিকার ধারক-বাহকগণ কুরআন দ্বারা হক ও না-হকের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হন।

এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটিকে আল্লাহ তা'আলা ফুরকান শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এটি কুরআনের আরেকটি নামও বটে। ফুরকান মানে পার্থক্যকারী। কুরআনের সত্যিকার ধারক-বাহকগণ কুরআনের আলোকে হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা, জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহর পথ-শয়তানের পথ নির্ণয় করতে পারে। কুরআনের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য অন্যতম।

কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি সংবাদের মধ্যেই কোন না কোন আদেশ-নিষেধ আছে!

কারো প্রশ্ন হতে পারে, রমাযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, আর এই হল কুরআনের তিন বৈশিষ্ট্য– একথা জেনে আমাদের ফায়দা কী? কেননা, এটা তো নিছক সংবাদ; আমাদের জন্য তো এখানে কোন আদেশ-নিষেধ নেই!

এর উত্তর হল, কুরআনে কারীমে সংবাদ আকারে আমাদেরকে যত তথ্য জানানো হয়েছে– যেগুলো বাহ্যত আদেশসূচকও নয়, নিষেধসূচকও নয়; উদাহরণত বিভিন্ন নবী, জনপদ, সম্প্রদায় ও খোদাদ্রোহী ব্যক্তিবর্গের ঘটনাবলী –প্রকৃতপক্ষে এর সবগুলোতে আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। কেননা, কুরআন ইতিহাসগ্রন্থ নয়, ইতিহাস বর্ণনার জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। কুরআন নাযিল হয়েছে আগাগোড়া হেদায়াতগ্রন্থ হিসেবে। প্রশ্ন হবে, তাহলে কুরআনে কারীমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কেন বিবৃত হয়েছে? এজন্য বিবৃত হয়েছে যে, ঐসব ঘটনার ভেতর বহু দিকনির্দেশনা আছে, শিক্ষাগ্রহণের বহু উপাদান আছে এবং আছে ঘটনার আড়ালে বহু আদেশ বা নিষেধ। যারা কুরআনে পারদর্শী, তারা চিন্তা করলে বুঝবে, এই সংবাদের আদেশ কী, বা এই সংবাদের নিষেধ কী? উদাহরণত এক হাদীসে নবীজী বলেছেন, 'তোমরা অনেক মুহাদ্দিস পাবে, যারা ফকীহ নন।' অর্থাৎ, হাদীস সংরক্ষণকারী বহু লোক নিজ সংরক্ষিত হাদীসের অন্তর্গত মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম নন। তো এটি একটি সংবাদ যে, সব মুহাদ্দিস ফকীহ নন। এই সংবাদের অন্তর্গত আদেশ হল– সব মুহাদ্দিস যখন ফকীহ নন, কাজেই তোমরা ফকীহ হওয়ার জন্য বা ফকীহ তৈরি করার জন্য ভিন্নভাবে প্রস্তুতি নাও। কারণ, উম্মতের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য-নতুন যেসব সমস্যা দেখা দিবে, ফকীহ না থাকলে সেগুলোর সমাধান কে দিবে? ফকীন নন এমন মুহাদ্দিস তো আর ফায়সালা দিতে পারেন না। ফায়সালা দিতে পারেন ফকীহগণ। এজন্য তোমরা কেউ নিজে ফকীহ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও এবং যারা ফকীহ হয়ে গেছো, তারা অন্যদেরকে ফকীহ বানানোর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করো। অর্থাৎ তাখাসসুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে, যারা বুখারী-মুসলিম ইত্যাদি হাদীসের কিতাব পড়ে এসেছে, তাদের থেকে অধিক মেধাবীদের বাছাই করে ফিকহ শেখাও, মুফতী বানাও। তাহলে এরা কুরআন-হাদীসের আলোকে সমস্যার সমাধান দিতে পারবে।

তো দেখা গেল, হাদীসে তাখাসসুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার কথা নেই। হাদীসে আছে, সব মুহাদ্দিস ফকীহ নন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে তাখাসসুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার আদেশ বিদ্যমান।

রমাযান মাসে কুরআন নাযিল হওয়ার সংবাদের মধ্যে তিনটি আদেশ রয়েছে

অনুরূপভাবে আমাদের আলোচ্য আয়াত– রমাযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে –এর মধ্যে তিনটি আদেশ রয়েছে। সেগুলো এই–

১. রমাযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করো। এটা যেহেতু কুরআনের মাস তাই অন্য মাসের তুলনায় তিলাওয়াত অধিক করতে হবে। অন্য মাসে এক খতম দিলে এ মাসে কমপক্ষে দুই খতম দিতে হবে।

২. সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত করতে গেলে নিয়মতান্ত্রিক শিখতে হবে। কাজেই তিলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ না থাকলে যেখানে সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখানো হয় সেখানে গিয়ে শেখো।

৩. শিখতে গেলে মাদরাসা লাগবে। মাদরাসায় গিয়ে শেখা ছাড়া সাধারণত তিলাওয়াত সহী-শুদ্ধ হয় না। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, কেউ খানকায় বা তাবলীগে সারাজীবন চিল্লা দিলেও কুরআন সহীহ হবে না। কুরআন সহীহ করার জন্য মাদরাসায় আসতে হয়। নূরানী পদ্ধতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মু'আল্লিম রাখতে হয়।

মোটকথা, এখানে তিনটি আদেশ দেয়া হয়েছে– ১. কুরআন বেশি করে পড়ো। ২. সহীহ-শুদ্ধ করে শেখো। ৩. সহীহ-শুদ্ধ শেখার জন্য বর্তমানে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, সে ব্যবস্থার নাম কওমী মাদরাসা। ঐ কওমী মাদরাসা কায়েম করো। অর্থাৎ, কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তোমার অবদান থাকতে হবে। ওখানে তোমার কুরবানী থাকতে হবে। কুরআন সহীহ-শুদ্ধ করার জন্য প্রত্যেক এলাকায় মাদরাসা থাকতে হবে। না থাকলে ঐ এলাকার সব লোক গোনাহগার হবে। প্রত্যেক গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায় মাদরাসা থাকা ফরযে কেফায়া। যদি কিছু আল্লাহর বান্দা কায়েম করে, তাহলে সবাই মাফ পেয়ে গেল। কেউ কায়েম করল না, সবাই গোনাহগার হবে। মাদরাসা না থাকলে মুসলিম শিশুরা কুরআন শিখবে কোত্থেকে? স্কুল-কলেজে পড়ে কেউ আই.এ., বি.এ., এম.এ. পাশ তো করতে পারবে, কিন্তু শুদ্ধ করে সূরা ফাতিহাও পড়তে পারবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন

অনেক ধনী ব্যক্তি এসে বলে, হুযূর! আমাদের মহল্লায় মসজিদ তৈরী হচ্ছে, আমি কি আমার যাকাতের টাকা ওখানে ব্যয় করতে পারব? তাদেরকে বলি, ভাই! এই মাসআলা তো আমাদের মক্তবের শিশুরাও জানে যে, যাকাত-ফেতরা মসজিদে দেয়া যায় না। এগুলো গরীবের হক। আর কওমী মাদরাসায় বহু গরীব তালিবে ইলম কুরআন-হাদীস শিক্ষা করে, আপনি চাইলে তাদের খানা-পিনায় সহযোগিতার জন্য আপনার যাকাত-ফেতরা মাদরাসায় দিতে পারেন। এই হল এক শ্রেণী, যারা যাকাত কোথায় দেয়া যায়, আর কোথায় দেয়া যায় না তা-ই জানে না। ধনীদের আরেক শ্রেণী আছে, যাদেরকে মাদরাসায় দান-সদকার কথা বললে তারা দুঃখ প্রকাশ করে যে, হুযূর! এ বছর আমার যাকাত-ফেতরা যা বের হয়েছে, সব দিয়ে ফেলেছি, আর বাকি নেই। এদের ভাবখানা এরকম যে, যাকাত-ফেতরা আদায় করার পর আর দীনী কাজে সাধারণ দান করা জায়েয নেই, জায়েয থাকলে তারা দান করতো! এখন যাকাত-ফেতরা দেয়ার পর যেহেতু বাকি টাকা থেকে দান করা জায়েয নেই, এজন্য সে অপারগ হয়ে গেছে!! বলুন, এই অজ্ঞতার চিকিৎসা কী?! অথচ আসল দান তো সাধারণ দান। যাকাত-ফেতরা তো বাধ্যতামূলক; এটা তো দিতেই হবে, না দিলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

যাই হোক, রমাযান মাসে কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র কওমী মাদরাসার প্রয়োজনাদির প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। যাকাত-ফেতরা তো দিবই, যাকাত-ফেতরা ছাড়াও সাধারণ দানের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

শ্রুতলিখন : মাওলানা আব্দুল্লাহ ইউসুফ
শিক্ষার্থী, ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

(ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ	কার্যক্রম
৭ শাওয়াল	মাদরাসা খোলা, সকল জামাআতের ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের ভর্তিফরম সংগ্রহ, তাইসীর থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (মৌখিক) ও ভর্তি।
৮ শাওয়াল	হিদায়াতুন্নাহব থেকে তাখাস্‌সুস পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক)।
৯ শাওয়াল	ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি (পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ঐ দিন ভর্তি হওয়া লাযেম, পরে সুযোগ থাকবে না)।
১০ শাওয়াল	মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা ও ভর্তি।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও শর্তাবলী

১. ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু নতুন/পুরাতন সকল ছাত্রের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজ ২কপি ছবি লাগবে।

২. নতুন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটি প্রশ্নের উত্তর উর্দূতে দিতে হবে।

পরীক্ষার বিষয়

ক্র.	জামা'আত	বিষয়
০১	তাফসীরুল কুরআন বিভাগ	জালালাইন, আল-ফাউযুল কাবীর
০২	উলূমুল হাদীস বিভাগ	বুখারী ১ম, শরহু নুখবাতিল ফিকার
০৩	ইফতা বিভাগ	বুখারী, হিদায়া ৩য়, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৪	আদব বিভাগ	আরবী কাওয়াইদ, ইবারত পাঠ, লেখালেখি ও অনুবাদের যোগ্যতা ও আধুনিক আরবীর সাথে সম্পৃক্তি
০৫	তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস)	মিশকাত, হিদায়া ৪র্থ
০৬	নিহায়ী সানী (মিশকাত)	জালালাইন, হিদায়া ১ম ও ২য়
০৭	নিহায়ী আউয়াল (জালালাইন)	শরহেবেকায়া, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৮	সানাবী সানী (শরহেবেকায়া)	শরহেজামী, কানযুদ্দাকাইক
০৯	সানাবী আউয়াল (শরহেজামী)	কাফিয়া, কুদূরী
১০	উস্তানী সালিস (কাফিয়া)	হিদায়াতুন্নাহব, ইলমুস সীগাহ
১১	উস্তানী সানী (হিদায়াতুন্নাহু)	নাহবেমীর, ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগঞ্জ
১২	উস্তানী আউয়াল (নাহবেমীর)	মীযান মুনশাঈব/ইলমুস সরফ ১ম ও ২য়, আরবী আদব
১৩	ইবতিদায়ী সানী (মীযান)	তাইসীর, ফারসী কী পেহলী কিতাব
১৪	ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর)	উর্দূ কায়িদা, নাযিরা (গাইরে হাফেযদের জন্য)

বি.দ্র. উল্লিখিত জামাআতগুলোর লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মতনখানীও পরীক্ষা হবে।

–জামি'আ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

ইসলাম যিন্দা হয় কুরবানী আর দরদ দ্বারা

হযরতুল আল্লাম মাওলানা আফযাল কাইমুরী দা.বা.

হযরত মাওলানা আফযাল কাইমুরী দা.বা. উপমহাদেশের কেন্দ্রীয় দীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতারাম নাযেমে তালীমাত (শিক্ষাসচিব) ও সিনিয়র মুহাদ্দিস। কিছুদিন পূর্বে তিনি আমাদের দেশে তাশরীফ এনেছিলেন। এসময় তিনি বিভিন্ন ইসলাহী মজলিস ও মাহফিলে শিরকত করেন। হযরত বিগত ১১ রজব ১৪৪০ হিজরী মোতাবেক ১৯ মার্চ ২০১৯ ঈসায়ী, রোজ মঙ্গলবার জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর মাদরাসায় উলামা-তলাবাদের একটি ইসলাহী মজলিসে গুরুত্বপূর্ণ দীনী মুযাকারা পেশ করেন। পাঠকের খেদমতে মুযাকারাটির অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো।

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحيم يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين

প্রথম আয়াতের সারকথা

মুহতারাম দীনী ভাইগণ, উলামায়ে কেরাম ও প্রাণাধিক প্রিয় তলাবা! আমি যে দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করেছি, তন্মধ্যে প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত অতীতের এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমাগত ভবিষ্যতের সমগ্র ইসলামী ইতিহাসের সারনির্যাস বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইসলাম, কুরআন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে একটি চিরন্তন ও অবশ্যম্ভাবী ওয়াদা ঘোষণা করেছেন। দীনে ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গাম ও নূর সাব্যস্ত করে বলেছেন, ইসলামের দুশমনেরা এই দীনকে মিটানোর জন্য, এই নূরকে নেভানোর জন্য ইসলামের সূচনাকাল থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতেই থাকবে। কিন্তু আমি ফায়সালা করে রেখেছি যে, পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে আমার এ পয়গাম অবশ্যই পৌঁছাবো এবং আমার এ নূর অবশ্যই পরিপূর্ণ করবো। আমি ফায়সালা করে রেখেছি, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 'আমিই এই কুরআন ও এই দীন নাযিল করেছি, আমি অবশ্যই এই দীন ও কুরআনের হেফাযত করবো।' (সূরা হিজর- ৯)

এই খোদায়ী হেফাযতের মোকাবেলায় হাজারো ঝড়ঝাপটা আসুক; কিন্তু হকের এই নূর অবিরাম জ্বলতেই থাকবে, উদ্দীপিত হতেই থাকবে এবং ছড়াতেই থাকবে। এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। মোটকথা, আয়াতে দু'টি বিষয় রয়েছে।

১. দুশমনদের তরফ থেকে সর্বকালে দীন মিটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা হতেই থাকবে।

২. কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষার পর ইসলাম আরো দীপ্তিময় ও জাজ্বল্যমান রূপ ধারণ করবে।

ইসলামবিদ্বেষীদের দুশমনী চিরায়ত, অনিঃশেষ

কুরআনে কারীম এবং দীনে ইসলামের বিরোধিতা শুরু থেকেই হবে। এই নূরকে নেভানোর জন্য অহর্নিশ চেষ্টা করা হবে। আর মুসলমানগণ অথবা স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইসলামের দুশমনদের সাথে দীনের পথে বাধাদান থেকে অথবা দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত রাখার জন্য কোনো ধরনের সমঝোতা করেন, কুরআনের ভাষ্যমতে এটা অসম্ভব। ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 'হে মুহাম্মাদ! ইয়াহুদী ও নাসারাসহ ইসলামের দুশমন যত জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, তারা আপনার প্রতি কোনো অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি নিজের দীন ছাড়েন।' (সূরা বাকারা-১২০)

কাজেই আমাদের এবং অন্য ধর্মগুলোর অনুসারীদের শত্রুতা মানুষ আর সাপের মতো; এরা এক কক্ষে থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ما سالمنا منذ حاربنا 'আমাদের এবং সাপের মাঝে স্বভাবজাত শত্রুতা যখন থেকে গড়ে উঠেছে তখন থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সন্ধি হয়নি।' এমনিভাবে যাদের স্বভাবে বক্রতা আর একগুঁয়েমি রয়েছে, কুরআনের ভাষায় নিজের দীন না ছাড়া পর্যন্ত তাদের সাথে সমঝোতার কোনো চেষ্টা সফল হবে না। বরং এই দুশমনী কিয়ামত অবধি কোনো না কোনো সূরতে চলতেই থাকবে।

এই দুশমনী অনুমিত ছিলো!

এখন লক্ষ করুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হেরা গুহায় প্রথমবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন ঘরে গেলেন, তখন নবীজীর চেহারা ছিলো বিবর্ণ, দেহ ছিলো কম্পমান। নিশ্চয়ই তখন ওহীর ওজনও ছিলো। শুধু ওহীর ওজনই নয়; দায়িত্বের অনুভূতিও ছিলো। তিনি শুধু নবীই ছিলেন না; খাতামুন্নাবিয়্যীন ছিলেন। প্রথমবার ওহী নাযিল হওয়ার সময়েই তিনি এই ওহীর যিম্মাদারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ তো স্বেচ্ছায় সমগ্র দুনিয়াবাসীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শামিল। এই তাওহীদের ধর্ম, দীনে ইসলাম নিয়ে দাঁড়ানোর অর্থ হলো, সমগ্র বিশ্বের, এমনকি নিজের আত্মীয়স্বজনের শত্রু হয়ে যাওয়া। দুনিয়ার কেউ এই দীনের সমর্থনকারী হবে না। প্রথমবার ওহী নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অনুভূতি হয়েছিলো।

হযরত খাদীজা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী হয়েছে? আপনি এত আতঙ্কিত কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, إنما أخشى على نفسي 'আমি আমার জীবন নিয়ে শঙ্কিত।' নবীজীর জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা রাযি. সান্ত্বনা দিলেন- كلا 'না না, আপনার অমঙ্গল করা হবে না। আপনার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্ট আসতে পারে না।' আপনার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা রয়েছে তা এ কথার জানান দেয় যে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করবেন। إنك لتصل الرحم 'আপনি আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করেন', وتحمل الكل 'অন্যদের বোঝা লাঘব করেন',

وتكسب المعدوم 'নিজ হাতে উপার্জন করে সহায়-সম্বলহীন দরিদ্রদের দান করেন', وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق 'আতিথেয়তা করেন এবং মানুষের বিপদাপদে তাদের সাহায্য করেন।' আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষের অনিষ্ট করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কঠিন পেরেশানির সময় হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযি. নবীজীকে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী উল্লেখ করে করে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

জন্ম থেকেই শত্রুতা

এক বা দুই বছর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ধারাবাহিক ওহীর ধারা আরম্ভ হলো। নবীজীকে হুকুম করা হলো, وأنذر عشيرتك الأقربين 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম শুনিয়ে দিন', তাদের কুফর, শিরক ও বদ আমলসমূহের মন্দ পরিণাম তাদেরকে বলে দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকলেন। এরা চল্লিশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আসছিলো। চল্লিশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে ছিলেন। সবাই তাঁকে সম্মান করতো। সবাই তাঁকে সাদিক ও আমীন (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) বলতো। সারা জীবনে হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ'র ব্যাপারে কারো কোনো অভিযোগ কখনো ছিলো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদেরকে সাফা পাহাড়ে একত্রিত করলেন। তিনি তাদের লক্ষ করে বললেন, যদি আমি তোমাদের এ সংবাদ দেই যে, এই সাফা পাহাড়ের পিছনেই একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণের অপেক্ষায় রয়েছে, যারা তোমাদের জীবন ও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করে নিবে? উপস্থিত সকল লোক সমস্বরে বললো, আমরা শতভাগ বিশ্বাস করে নিবো। কেননা ما جربنا عليك كذبا 'আমাদের কখনো আপনার থেকে মিথ্যার পরীক্ষা নিতে হয়নি।' চল্লিশ বছরের সমগ্র জীবনে –যার মধ্যে শৈশব-কৈশোর-যৌবনও ছিলো– যখন আপনি কখনো মিথ্যা বলেননি, তাহলে এই চল্লিশ বছর পর আপনি কীভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারেন!

দেখুন! তারা পাহাড়েই ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাহাড়ের অপরদিকে গিয়ে তারা উঁকি দিয়ে দেখতে পারতো। কিন্তু তারা বললো, না, আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই। আপনার কথা বিশ্বাস করার জন্য আমাদের উঁকি দেয়ার প্রয়োজন নেই। আপনার বলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ বললেন, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তাহলে কামিয়াব হয়ে যাবে।' এই কালেমা না বললে তোমাদের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে।

নিজের আপন চাচা মজমার মধ্য হতে বললো, تبا لك ألهذا جمعتنا 'তুমি ধ্বংস হও; তুমি এই কথা বলার জন্য আমাদের সবাইকে একত্রিত করেছ?'

কী হলো?

দুশমনী শুরু হয়ে গেলো।

কোথা থেকে?

ঘর থেকে, আপন চাচার দিক থেকে।

পুরো কুরাইশ সম্প্রদায়, সমস্ত আপনজন দুশমন হয়ে গেলো, বিরোধী হয়ে গেলো। পরিণামে কী হয়েছে? ইসলামের অগ্রযাত্রা কি থেমে গেছে? থামেনি। বরং বাড়তে থেকেছে। ধীরেধীরে হলেও বেড়েছে।

কোনো বিপদই প্রতিবন্ধক নয়

এটা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা যে, ইসলামের যত বিরোধিতাকারী আর যত দুশমন রয়েছে, তারা এই চেরাগকে নিজেদের মুখ দিয়ে, কাজকর্ম দিয়ে, যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে, শক্তি দিয়ে নিভানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই নূরকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শুরু থেকেই এটা দেখিয়েছেন। নানা ধরনের সমস্যা, নানান সংকট একের পর এক এসেছে; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী বান্দাদের উপর বিভিন্ন সমস্যা আর বিপদ-মুসিবত এসেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! ইসলামের অগ্রযাত্রা এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। নূরের সম্পূর্ণতা অব্যাহত থেকেছে। ইসলাম গ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েছে। প্রজ্বলিত অঙ্গারের ওপর শোয়ানো হয়েছে, গলায় রশি বেঁধে অলিগলিতে হেঁচড়ানো হয়েছে, হারাম শরীফের সামনে গরম নুড়ি-বালিতে শোয়ানো হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার পথে কাঁটা বিছানো হয়েছে, নবীজীর মাথায় উটের নাড়িভুঁড়ি চাপানো হয়েছে। এভাবে নূরকে নেভানোর হরদম চেষ্টা করা হয়েছে; তবুও ইসলাম আগে বেড়েছে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ছিলো, والله متم نوره 'আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না।' যত ধরনের সমস্যা, সংকট, জটিলতা যা-ই আসুক, কোনোকিছুই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বা ঈমানদার বান্দাগণের দীন ও ঈমানের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না, ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ওয়াদা সর্বকালে পূর্ণ করেছেন।

দীন যিন্দা হওয়ার জন্য কুরবানী অপরিহার্য

আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্য মুসলমানদের যত কুরবানীর প্রয়োজন হবে, সমস্ত কুরবানী নিবেন এবং প্রতিদানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে পাথরের মতো এমন শক্ত ঈমান তৈরি করে দিবেন যে, তারা সমস্ত বিপদ-আপদে অবিচল থাকবে, দুশমনের সামনে কখনো মাথা নত করবে না। কুরবানীর নামই হলো ইসলাম। কুরবানী হলো ইসলামের রক্তের মতো। ইসলামের শিরা-উপশিরায় কুরবানীই প্রবাহিত হয়। এর দ্বারাই দীন যিন্দা থাকে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থেকে দীন যিন্দা হয় না।

দীন ইসলামকে যিন্দা করার জন্য যদি পায়ে একটা কাঁটার ভাঙা টুকরোও বিঁধে যায়, তবে তার প্রতিদানও আল্লাহ তা'আলার কাছে নির্ধারিত হয়ে যায়। হযরত বেলাল রাযি.-কে অঙ্গারের উপর শোয়ানো, অলিগলিতে হেঁচড়ানো কোনোকিছুই প্রতিদান-শূন্য ছিলো না; প্রত্যেক কুরবানীর সওয়াব-প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। الله شكور 'আল্লাহ তা'আলা শাকূর;' তিনি বান্দাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আমলও কবুল করে তার পুরস্কার দেন। আমার-আপনার মতো নাফরমান নিকৃষ্ট বান্দাদের আমলও কবুল করে নেন। আর তারা তো ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র সাহাবী। তাদের আমল, তাদের কুরবানী কেন কবুল করা হবে না?

পুরো ইতিহাস দেখে নিন। উম্মত সব যামানায় বিপদাপন্ন হয়েছে, সংকটাপন্ন হয়েছে; কিন্তু এরপর ইসলাম আগে বেড়েছে। বিপদাপদের শিকার হওয়ায় আর সংকটে নিমজ্জিত হওয়ার কারণেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে মদীনা ও হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেয়া

হয়েছিলো। প্রিয় জন্মভূমি মক্কা মুকাররমা ছাড়তে হয়েছিলো, যে স্থান সম্পর্কে সে সকল সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিলো যে, এই মক্কার একটি নামাযের সওয়াব অন্যস্থানের মসজিদের এক লাখ নামাযের সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছিলো মক্কা ছেড়ে হাবশা-মদীনা যাওয়ার, তাই এত ফযীলত জানা সত্ত্বেও হিজরত করে চলে গিয়েছেন। তাঁদের এই হিজরত ও কুরবানীর কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে আগে বাড়িয়েছিলেন।

এই নূর ফুঁৎকারে প্রজ্জ্বলিত হয় বহুগুণ!

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে মদীনা চলে গেলেন। তারা নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত উপার্জন কুরাইশের জন্য ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন। এরপর তো কুরাইশের দুশমনী করার কথা ছিলো না। অথচ মদীনায় আসার পরও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য কুরাইশের প্ল্যান-পরিকল্পনা, যুদ্ধের প্রস্তুতি, সর্বাত্মক যুদ্ধ সবই অব্যাহত ছিলো। এর কারণ কী ছিলো? আসল কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলাই এই সবকিছু করিয়েছেন। তিনি জানেন, এই দুশমন যতক্ষণ যত আক্রমণ করতে থাকবে, এই ইসলামের নূর ততোই প্রজ্জ্বলিত হবে। এই দুশমন যত একে দাবিয়ে রাখবে, ততো এটা উদ্দীপ্ত হবে।

এ কারণেই কুরাইশরা নিশ্চিন্তে বসে ছিলো না। মদীনার ইহুদীরাও নিশ্চুপ ছিলো না। ইসলামের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে যুদ্ধ উস্কে দেয়া হলো, ধীরে ধীরে সমগ্র আরব যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। খন্দক যুদ্ধে সমগ্র আরবের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো। তখন কাদের সাথে মুসলমানদের দুশমনী ছিলো? তারা নিশ্চিন্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। নিজেদের মসজিদেই নামায পড়ছিলেন। নিজেদের ঘরে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকির করছিলেন। কিন্তু না, কাফেরদেরকে উস্কে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলার কুদরত তাদেরকে উস্কে দিচ্ছিলো যে, আসো, একত্রিত হও। এরপর যখন এই সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলায় এলো, তখন তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো দশ হাজার। কোনো কোনো বর্ণনামতে চব্বিশ হাজার। আর মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজারেরও কম ছিলো। শুরুতে সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিলো। পর্যায়ক্রমে তাদের সংখ্যা তিন হাজারে উপনীত হয়েছিলো। এরপর হুদায়বিয়ার সন্ধিতে শরীক হয়েছিলেন চৌদ্দ'শ বালেগ পুরুষ সাহাবী। দুই বছর পর মক্কাবিজয়ের সময় মুসলমানদের সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছে গিয়েছিলো। হুনাইন যুদ্ধে হয়েছিলো বারো হাজার। এর দুই বছর পর বিদায় হজ্বের সময় আরবের কোনো ঘর এমন বাকী ছিলো না, যেখানে কোনো মুসলমান ছিলো না। আমি বলতে চাচ্ছি, ইসলাম ও মুসলমানেরা তাদের অগ্রযাত্রায় প্রতি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা দিনদিন বেড়েছে বৈ কমেনি।

আঘাতকারীর সর্বনাশ!

এরপরের ইতিহাস দেখুন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনে নবম হিজরী থেকে যখন সমগ্র আরবে ইসলাম প্রসারিত হচ্ছিলো, তখন এতে রোম-পারস্যের কী ক্ষতি হচ্ছিলো? কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরও আত্মম্ভরিতা জেগেছিলো। নিজেদের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর জোরে তারা নিশ্চিত ছিলো যে, আরবের বেদুঈন গোষ্ঠীকে যখন যেভাবে ইচ্ছা, পরাজিত করতে পারবে।

পারস্যের একজন নামকরা কবি ছিলেন ফেরদৌসী। পরবর্তীতে মুসলমান হলেও তিনি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কাব্যাকারে স্বজাতির গৌরবগাঁথা রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে তিনি পারসিক সেনাপতি রুস্তমের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, আরে! এই আরবজাতি, যারা মৃত প্রাণীর গোশত খেতো, উটের গোশত, গুঁইসাপ এবং হায়েনার গোশত খেতো, এখন তাদের পারস্যে হামলা করার দুঃসাহস হয়ে গেলো!

আরে! তারা তো হামলা করেননি। বরং পারসিকরাই মুসলমানদের ডেকে এনে হামলা করতে বাধ্য করেছে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী চিঠি মোবারক ছিঁড়ে টুকরোটুকরো করেছিলো, ছিন্নভিন্ন করেছিলো। আমি বলতে চাচ্ছি, তাদের এলার্জি হয়েছিলো, তারাই উতলা হয়েছিলো, তারাই আগে উস্কানি দিয়েছিলো। এরপর কী হলো? খেলাফতে রাশেদার যামানা শেষ হতে না হতেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ৪০ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিসরা-কায়সারের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো, সেসব সাম্রাজ্যের কোনো চিহ্নও আর অবশিষ্ট রইলো না।

এভাবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূরণ হচ্ছিলো ويأبى الله إلا أن يتم نوره 'ইসলামের বিরুদ্ধে সকল দুশমন এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাক; কিন্তু এই নূর পরিপূর্ণ হবেই।'

দীন কারো মুখাপেক্ষী নয়

এবার চলো সামনে। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে বনু উমাইয়া এবং খেলাফতে বনু আব্বাসিয়ার যামানা চলেছে। খেলাফত, রাজত্ব এবং বাহ্যিক সমরশক্তির সাথে ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিলো। এমনকি দুনিয়াবাসী মনে করতে শুরু করেছিলো যে, ইসলামের প্রসার তরবারীর জোরে হয়েছে এবং ইসলাম তরবারীর জোরেই টিকে আছে। এই ভুল ধারণার ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে আরামপ্রিয়তা দেখা দিলো। এদের মধ্যে জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলো। ন্যায়বিচার ও ইনসাফকে গলা টিপে হত্যা করা হলো। কেবলমাত্র বাহ্যিক প্রদর্শনী ছাড়া ইসলাম নামের কোনোকিছু আর এদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলো না। অবশেষে তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার আযাব এলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান ও ইসলামের পরোয়া করলেন না। الله الصمد 'আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী।'

দারুল উলূমের আকাবিরদের অন্যতম হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ.-এর ব্যাপারে আমরা শুনেছি যে, তিনি মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন। শাগরেদগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি এতো পেরেশান কেন? অথচ আপনার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য– সমগ্র জীবনটাই তো দীনের খিদমতে অতিবাহিত হয়েছে। আপনি হযরত কাসেম নানুতবী এবং হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর মতো ব্যক্তিত্বদের তরবিয়ত পেয়েছেন। আপনার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ইংরেজদের মোকাবেলায় ব্যয় হয়েছে। এতটা প্রিয় প্রশংসনীয় আপনার যিন্দেগী। সমগ্র জীবন ইসলামের ছাঁচে গঠিত। এতদসত্ত্বেও আপনি কী কারণে কাঁদছেন? হযরত জবাবে বললেন, ভাই! এই সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সত্তা অমুখাপেক্ষী। তিনি মাহমূদের এবং অন্যদের মুখাপেক্ষী নন। এই কথার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে যে,

(২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বি শে ষ সা ক্ষা ৎ কা র

এই হামলার দায় কোনো পক্ষের উপর চাপাবেন না

–আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.

গত ২২ মার্চ পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেমে দীন শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.-এর উপর ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী হামলা হয়। হামলায় তিনজন শহীদ ও একজন গুরুতর আহত হন। তবে আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. ও তার পরিবার হামলার ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পান। হামলার পর পাকিস্তানভিত্তিক অনলাইন পোর্টাল উম্মাত ডটনেট-কে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.। সেখানে তিনি হামলার বিবরণ, সম্ভাব্য হামলাকারী, পূর্বে পাওয়া বিভিন্ন হুমকি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি বাংলায় ভাষান্তর করেছেন আবরার আবদুল্লাহ।

উম্মাত : চতুর্মুখী সন্ত্রাসী হামলা থেকে আপনি যেভাবে বেঁচে গেছেন তা বিস্ময়কর। হামলার সময় আপনি কোনো দু'আ পড়ছিলেন?

আল্লামা তাকী উসমানী : বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করার পরও আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমনভাবে হেফাযত করেছেন যে, আমার একটু চামড়াও ছিলেনি। তবে আমার দুইজন (এবং কয়েকদিন পর আরেকজন) সাথী শহীদ হয়েছেন এবং দুইজন সাথী আহত হয়েছেন। আমি খুবই ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত।

আপনি জানতে চেয়েছেন, আমি দু'আ পড়ি কিনা? আমি দু'আ পড়ি না, দু'আ করি। দু'আ পড়া আর করার মধ্যে পার্থক্য আছে। সফরের সময় দু'আ-করা আমার অভ্যাস। সাধারণত বৃহস্পতিবার রাতেই সূরা কাহাফ পড়ে নেই। প্রতিদিন এক পারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করি। সফরে থাকলে রাস্তায় তিলাওয়াত করে পারা শেষ করি। যখন হামলা হয় আমি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলাম। আমি সূরাও শুরু করেছি অন্যদিকে গুলিবর্ষণও শুরু হয়েছে। কয়েকটি গুলি আমার গাড়ির সামনের কাচে এসে লাগে।

আশ্চর্য বিষয়! আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, হঠাৎ বুঝি প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। কিন্তু গাড়ির সামনের ভাঙ্গা কাচে চোখ পড়ার পর বুঝলাম বৃষ্টি নয়, গুলিবর্ষণ শুরু হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম, কোনো সন্ত্রাসী আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। খেয়াল করলাম হামলাকারীরা হোন্ডায় করে সামনে পেছনে যাচ্ছে।

উম্মাত : হামলাকারীরা কয়জন ছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : তিনটি মোটর সাইকেলে দুইজন করে ছয়জন হামলাকারী এসেছিলো। আমি আগেই বলেছি, আমি তখন তিলাওয়াত করছিলাম। আমার দুই হাতে কুরআন শরীফ ধরা ছিলো। তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলাম। হামলার মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম না কোথায় আছি। তাই তাৎক্ষণিক বুঝতে পারিনি হামলাকারী কয়জন ছিলো? উইন্ডস্ক্রিন ভেঙ্গে যাওয়ার পর গাড়ির ডানপাশের কাচ ভেঙ্গে যায়।

উম্মাত : আকস্মিক হামলায় কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : এক গাড়িতে পুলিশ সদস্য ও আমার নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন। আমি, আমার স্ত্রী ও নাতি-নাতনি এক আসনে বসা ছিলাম। পেছন থেকে ছোঁড়া গুলি মাথার একদম কাছ দিয়ে সামনের আসনের পেছনে লাগে। এমন সময় ড্রাইভার হাবীব গুলিবিদ্ধ হয়। সে আমাকে শুয়ে পড়তে বললো। কিন্তু শোয়ার সুযোগ ছিলো না। আমি নিচু হয়ে থাকলাম। তখন চতুর্দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। ড্রাইভার আহত অবস্থায় গাড়ি চালাতে লাগলো। আমরা ভেবেছিলাম তারা চলে গেছে। কিন্তু হাবীব চিৎকার দিয়ে বললো, ওরা ফিরে আসছে। আবার গুলিবর্ষণ শুরু হলো।

একটি বিস্ময়কর কথা বলি, আমি গাড়ির বামপাশে বসা ছিলাম। সন্ত্রাসীরা বাম দরজায় গুলি চালালো। গুলির আঘাতে দরজা ছিদ্র হয়ে গেছে। হিসেব মতো সেটা আমার পায়ে লাগার কথা। কিন্তু তা লাগেনি এবং গুলিটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমি ও আমার পরিবার গাড়ির পেছনের আসনে বসা ছিলাম। পেছন দিক থেকেই হামলাকারীরা বেশি গুলি ছুঁড়েছে। পেছনের কাচটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে হামলাকারীদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি। কাচ ভেঙ্গে যাওয়ার পরও গুলি ছোঁড়া হয়। কিছু গুলি পেছনের আসনে রডে লাগে। কিছু গুলি গ্লাস আটকে রাখার রাবারে লাগে। আল্লাহ আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করেছেন।

উম্মাত : আপনার স্ত্রী ও বাচ্চাদের অবস্থা কী হয়েছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : আমার নাতি ইয়ামানের বয়স পাঁচ বছর এবং নাতনি দিনার বয়স সাত বছর। তারা বুঝতেই পারছিলো না কী হচ্ছে? যখন ড্রাইভারের গায়ে গুলি লাগলো তখন ইয়ামান বুকে হাত দিয়ে বললো, দাদা! আমার এখানে লেগেছে। আমি তখন ভয় পেয়ে যাই। বলা যায়, আমার উপর দিয়ে কিয়ামত অতিবাহিত হয়। আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে জামার বোতাম খুলে দেখি গাড়ির কাচের একটি টুকরো সেখানে লেগেছে। কাচের টুকরো লেগে আমার স্ত্রীর দুই হাত কেটে গেছে। হামলার সময় তার হাতেও কুরআন শরীফ ছিলো। সে-ও তিলাওয়াত করছিলো। আল্লাহর অনুগ্রহ সে-ও ভয় পায়নি। আমার স্ত্রী তখন সূরা ইয়াসিনের এই আয়াত পাঠ করছিলো, (অর্থ) 'আমি তাদের সামনে এবং পেছনে দেয়াল তৈরি করলাম এবং তাদের চোখে ঢেলে দিলাম পর্দা।'

উম্মাত : হামলার সময় আপনার ড্রাইভার বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

আল্লামা তাকী উসমানী : হ্যাঁ, সে জীবনবাজি রেখে ড্রাইভিং করেছে। হামলাকারীরা প্রথমে তাকেই টার্গেটে পরিণত করে। কিন্তু আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। সে আহত হওয়ার পরও সাহসের সাথে গাড়ি ড্রাইভ করেছে। যদি সে থেমে যেতো তবে ঘটনা ভিন্ন কিছু হতে পারতো। হামলার সময় তার দুই হাতে ও কনুইতে গুলি লাগে। প্রথমে গুলি লাগার পর প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছিলো। সে আমাকে বললো, আমার এক হাত অবশ হয়ে গেছে। সে অন্য হাতে গাড়ি চালাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় হাতও অবশ হতে শুরু করে। সে হাতের আঙুল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যায়। আমি তাকে বলেছিলাম, দাও আমি গাড়ি চালাই। কিন্তু পুনরায় হামলার আশঙ্কায় সে তাতে রাজি হয়নি। আমি যখন পরবর্তীতে ফোন করে তার খোঁজ-খবর নিয়েছি, সে বলেছে, আমার যদি দশটি জীবন থাকতো তবে আমি তা আপনার জন্য কুরবান করতাম!

উম্মাত : সন্ত্রাসীরা দীর্ঘ সময় ধরে আপনার উপর আক্রমণ করেছে। পুলিশ কোথায় ছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : ঘটনাস্থলে তো কোনো পুলিশ দেখিনি। কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে আসার পর পুলিশের একটি টহল দলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আমি তাদেরকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, আমার ড্রাইভার গুরুতর আহত। আপনাদের একজন সদস্য দিন, যে গাড়িটি চালিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। কিন্তু পুলিশ সাহায্য করতে অস্বীকার করে বললো, আপনারাই গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে যান। আমি বুঝতে পারছিলাম, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। তাই গাড়ি না থামিয়েই চলতে চলতে তাদের সাথে কথা বলছিলাম। যখন তারা সাহায্য করতে অস্বীকার করলো, ড্রাইভার নিজেই গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে পৌঁছালো। আল্লাহর অনুগ্রহ রাস্তায় যানজট ছিলো না। মাত্র দশ মিনিটেই হাসপাতালে পৌঁছাই আমরা।

উম্মাত : ইতিপূর্বে আপনাকে কয়েকবার হুমকি দেয়া হয়েছিলো। সেটা কবে থেকে শুরু হয়?

আল্লামা তাকী উসমানী : সাম্প্রতিক সময়ে কোনো হুমকি আমি পাইনি। কিন্তু এক দেড় বছর পূর্বে দুয়েকবার হুমকি দেয়া হয়েছিলো। আমি তা আমলে নেইনি। প্রশাসনকেও জানাইনি। কারণ, যে সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছিলো তার সঙ্গে হুমকিদাতার কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিলো না। তাই এই হুমকিরও কোনো ভিত্তি ছিলো না।

উম্মাত : আপনাকে তারা কীভাবে হুমকি দিয়েছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : অধিকাংশ সময় হুমকি দেয়া হয় নাম-ঠিকানা বিহীন চিঠির মাধ্যমে। কখনো কখনো হুমকিদাতা নিজেকে দায়েশের সদস্য হিসেবে দাবি করে। কখনো এমনও লেখা ছিল, 'আমি দায়েশের কমান্ডার বলছি। আপনি যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তাতে আমরা আপনাকে ছাড়বো না।'

উম্মাত : কোন অবস্থানের কথা বলছে তারা?

আল্লামা তাকী উসমানী : আমি সব সময় আমাদের দেশে সশস্ত্র তৎপরতা ও আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানিয়ে এসেছি। তারা সেই অবস্থানের দিকেই ইঙ্গিত করেছে। চিঠি দায়েশ ও টিটিপি উভয় সংগঠনের নামে এসেছে। কিন্তু আমি জানি না, এই চিঠি আসল নাকি বানোয়াট? কারণ, এমনও হয়েছে যে, টিটিপির কমান্ডার দাবি করে আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। আবার টিটিপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তারা এমন কোনো চিঠি পাঠায়নি। এজন্য আমি হুমকিকে গুরুত্ব দিইনি। দুয়েকবার স্থানীয় নম্বর থেকে ফোন দিয়ে বলা হয়েছে, আমরা আপনাকে ছাড়বো না। আমি বলেছি, আল্লাহই সব ক্ষমতার মালিক।

দেশের ভেতর সশস্ত্র তৎপরতার ব্যাপারে আমার অবস্থান স্পষ্ট হওয়ার পরও আমি নিশ্চিত আমার কোনো শত্রু নেই। আর হুমকিদাতারা নিজেদেরকে যে সংগঠনের বলে দাবি করেছে সেটাও সত্য নয়। (আমার জানামতে) এই মুহূর্তে পাকিস্তানে দায়েশ নেই। একটা মজার ঘটনা হলো, একবার চিঠিতে লেখা হয় আমি দায়েশের কমান্ডার এবং আপনার আশেপাশেই থাকি।

উম্মাত : সিন্ধের গভর্নর ইমরান ইসমাইল বলেছেন, আপনাকে হুমকি দেয়া হয়েছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : আমার মনে হয়, তিনি কোথাও ভুল করছেন। আমার সেটা জানা নেই। কিছুদিন আগে যখন উলামায়ে কেরামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হলো, তখন পাকিস্তান বেফাকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, কোনো কোনো আলেমকে হুমকি দেয়া হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেনো পুনর্বহাল করা হয়। সম্ভবত তিনি আমাকে তাদের একজন মনে করেছেন। হামলার পর তিনি আমার অবস্থা জানতে এসেছিলেন। তখন কথা হয়েছে। এর আগে তার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি।

উম্মাত : সরকারের পক্ষ থেকে আপনার নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

আল্লামা তাকী উসমানী : সরকার আমার নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা শুরু থেকে করেনি। আমাকে কোনো নিরাপত্তাকর্মী দেয়া হয়নি। এক-দেড় বছর আগে আমাকে একজন পুলিশ সদস্য দেয়া হয়। কিন্তু আমি তাকে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেই। কারণ, আমি বাইরে খুব কম যাই। তাছাড়া আমার নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মীও আছে। কিন্তু কয়েকজন পরামর্শ দিলেন আমি যেন তাকে ফেরত না পাঠাই। আমিও আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। উলামায়ে কেরামের নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়ার পর সেই পুলিশ সদস্যকেও প্রত্যাহার করা হয়। একদিন পর আবার দুইজন নিরাপত্তাকর্মী পাঠানো হয়। হামলার একদিন আগে একজন নিরাপত্তাকর্মীকে প্রত্যাহার করা হয়। হামলার সময় আমার সাথে ফারুক নামের একজন সরকারী নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন এবং তিনি শহীদ হয়েছেন।

উম্মাত : মানুষ বলে, ষষ্ঠ ইন্দ্রীয় মানুষকে আগাম অনেক কিছু বলে দেয়। হামলার দিন আপনার এমন কিছু হয়েছিলো?

আল্লামা তাকী উসমানী : মোটেও না। হ্যাঁ, ওরা যখন গুলি করছিলো, তখন আমার বিশ্বাস ছিলো আমার কিছু হবে না। এটা এজন্য যে, আমার বিশ্বাস ছিলো আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।

উম্মাত : সবাই বলছে, হামলা অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিলো।

আল্লামা তাকী উসমানী : হ্যাঁ, অত্যন্ত পরিকল্পিত ছিলো। এই সপ্তাহে আমার জুমু'আর মসজিদ (পাকিস্তানের) বায়তুল মুকাররমে নামায পড়ানোর কথা ছিলো না। মুলতানের একটি কনফারেন্সে আমার অংশগ্রহণের কথা ছিলো। কিন্তু আকস্মিক আমার ফ্লাইট বাতিল হয়। কিন্তু সেটা খুব কম মানুষেরই জানা ছিলো। হামলাকারীরা সেটা নিশ্চিত হয়েছে এবং হামলার পরিকল্পনা করেছে। দুপুর বারোটার দিকে কয়েকজন অপরিচিত মানুষ দারুল উলূম করাচি গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আজ এখানে কে নামায পড়াবেন। আমরা মুফতী সাহেবের পেছনে নামায পড়তে এসেছি। তাদেরকে বলা হয়, আমি বায়তুল মুকাররম নামায পড়াবো। সম্ভত তারা জানতে চেয়েছিলো, আমি কোথায় নামায পড়াবো এবং কখন বের হবো।

উম্মাত : ঘটনার তদন্ত কীভাবে আগাচ্ছে? আপনি কি এই তদন্তে সন্তুষ্ট?

আল্লামা তাকী উসমানী : হ্যাঁ, যেভাবে তদন্তের কাজ চলছে তাতে আমি সন্তুষ্ট। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে এখনই সবকিছু বলার সময় আসেনি।

উম্মাত : হামলার ঘটনাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন?

আল্লামা তাকী উসমানী : আমি প্রথমে বলবো, হামলার দায় কোনো সংগঠন বা পক্ষের উপর না চাপানো। বাহ্যত মনে হয়, দেশের শত্রুরা এই হামলা করেছে। তারা পাকিস্তান দিবসে দেশে একটি অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

উম্মাত : হামলাকারীদের আপনি কী বার্তা দিতে চান?

আল্লামা তাকী উসমানী : আমি তাদেরকে হেদায়েতের পথে আহবান জানাবো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েত দান করুন। কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন।

সৌজন্যে : ইসলাম টাইমস ২৪ ডট কম

তাবলীগী বয়ান

খুলাফায়ে রাশেদীনের চার যুগে মিলবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান

হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.-এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম

আলহামদুলিল্লাহ! কাকরাইলের বিশিষ্ট মুরুব্বী ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুক্বীত সাহেব রহ.-এর বিশেষ নির্দেশে আমি ছিলাম হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর বিশেষ সোহবতপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর বাংলাদেশে আগমনকালীন (১৯৮৮ ইং-১৯৯৬ ইং) সফরসঙ্গী ও সার্বক্ষণিক বয়ান লেখক এবং সেই সাথে অন্যান্য বিশিষ্ট মুরুব্বীদের বিশেষ বিশেষ বয়ান লেখক। যদিও হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী সাহেব রহ. হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ.-কে দেখেননি, তথাপি তিনি ছিলেন হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ.-এর খাছ সোহবতপ্রাপ্ত তিন বুযুর্গের (হযরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ., হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.) বিশেষ সোহবতপ্রাপ্ত এবং তাঁর নিজ ভাষ্যমতে তিনি ছিলেন খেদমতের মাধ্যমে তাঁর মমতাময়ী মায়ের হৃদয় উজাড় করা দু'আর ফসল। বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতে তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ইলমের খাযানা হতে বিশেষ ইলমপ্রাপ্ত ও হিকমতের ফোয়ারা। ১৯৮৭ সালের টঙ্গী ইজতিমার পর হযরত মাওলানা ইন'আমুল হাসান রহ.-এর সাথে কাকরাইলে অবস্থানকালে একই বিষয়ের উপর প্রদত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বয়ান এখানে উপস্থাপন করা হল। এর মধ্যে তাবলীগের বর্তমান সঙ্কট ও সমস্যাসহ কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল হালত ও সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আপন মেহেরবানীতে আমাদের প্রত্যেককে বয়ান দু'টি সহীহভাবে বুঝে এবং আমল করে উভয় জগতে কামিয়াব হওয়ার তাওফীক দান করুন। আ-মী-ন।

বয়ান-০১

তারিখ : ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৭, শনিবার, বাদ ফজর। স্থান : কাকরাইল মসজিদ

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত পর্যন্ত নবী করে পাঠিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এমন কোন হালত আসবে না, যা আগে আসেনি। কিয়ামত পর্যন্ত যত হালত আসবে তার সমাধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতে পাওয়া যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদ্দশায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বাতলে গেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে খুলাফায়ে রাশেদীনের যিন্দেগীতে সমাধান রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও খুলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে মজবুত করে ধরতে বলা হয়েছে। এতে উম্মতের রাহবারী (Guideline) হবে; উম্মত পথভ্রষ্ট হবে না।

দাওয়াতের কাজ দ্বারাই দীনের কাজ শুরু হয়। দাওয়াতের কাজই বাকি থাকবে। নবীযুগে মক্কা শরীফে ইনফিরাদীভাবে আর মদীনা শরীফে ইজতেমায়ীভাবে দাওয়াতের মেহনত হয়।

বদরের ময়দানে তিন রকম আমলের ভিত্তিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্য আসে।

يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার ফেরেশতাকে তোমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিবেন, যারা তাদের বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত থাকবে। (সূরা আলে ইমরান- ১২৫)

এখানে তিনটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে– ১. তাকওয়া। ২. সবর। ৩. আল্লাহর রব্বুল আলামীনের কাছে গিরয়াযারী (কান্নাকাটি)।

উহুদের ময়দানে চার জিনিসের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য উঠে যায়–

إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ

(এক) তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ করলে।

(দুই) নির্দেশ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করলে।

(তিন) যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দের বস্তু দেখালেন, তখন তোমরা নিজেদের আমীরের অমান্য করলে। (সূরা নিসা- ৫২)

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

(চার) তোমাদের মধ্যে কিছু লোক দুনিয়া কামনা করছিল, আর কিছু লোক আখেরাত কামনা করছিল। (সূরা আলে ইমরান- ১৫২)

দুনিয়ার দিকে নজর যাওয়ার কারণে তিন ধরনের কমযোরী (দুর্বলতা) দেখা দেয়– ১. রায়ের কমযোরী। ২. আপসে কষাকষি। ৩. কথা না শোনা।

হুনাইন যুদ্ধে উজ্ব (আত্মতুষ্টি)-এর কারণে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসমান থেকেই (শুরুতেই) রুখে যায়।

কিয়ামত পর্যন্ত দীন কখনও চমকাবে কখনও মিটবে। যখন দীন দুনিয়া থেকে মিটতে থাকে এবং বদদীনী বিস্তার লাভ করতে থাকে তখন কী চিকিৎসা বা কী করণীয় তা আমরা হযরত আবূ বকর রাযি.-এর দাওর (যামানা) থেকে জানতে পারি। তাঁর খেলাফতের শুরুর দিকে দীনকে মিটিয়ে দেয়ার নানারকম নকশা কায়েম করা হয়েছিল। মুসায়লামা কায্যাব মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করেছিল। রোম-পারস্যের শাসকরা মদীনা আক্রমণের হুমকি-ধমকি দিচ্ছিল। এ কঠিন সময়ে হযরত আবূ বকর রাযি. পুরো উম্মতকে জান-মালের কুরবানীর উপর প্রস্তুত করেন।

জ্বী, আল্লাহ তা'আলার দীনের জন্যে জান-মালের কুরবানীর উপর সকল ফিতনা দূর হবে, দীন চমকাবে। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যার এটাই সমাধান।

দীন যিন্দা হওয়ার পর দুনিয়া যখন পায়ের তলায় আসতে শুরু করবে তখন কী করব? তখন হযরত উমর রাযি.-এর দাওর থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

হযরত উমর রাযি.-এর দাওরের বৈশিষ্ট্য

এক. সাদেগী বজায় রাখা। সম্পদ যতই আসুক আগের মতই সাদাসিধা থাকা। খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি কাপড়-চোপড়ে পরিবর্তন আনেননি। পাকা বাড়ি পছন্দ করতেন না। বানাতেও দেননি। মসজিদও পাকা করেননি।

দুই. তাহলে অর্জিত সম্পদ কী করা হবে? কুরআন-হাদীস মোতাবেক খরচ করা হবে। বেশি বেশি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হবে। গরীব ও অসুস্থের উপর খরচ করা হবে। হযরত উমর রাযি. অর্থ জমা করেননি, আল্লাহর রাস্তায় খরচ

করেছেন। এত খরচ করেছেন যে, যে অর্থ এসেছে তা শেষ হয়ে কর্জও হয়ে গেছে। তাঁর ইন্তেকালের সময় কর্জ ছিল ৮৪ হাজার দিরহাম।

যখন মাল আসে, তার সাথে ইখতেলাফও আসে। এটা দেখি হযরত উসমান রাযি.-এর যমানায়। কারণ যখন প্রাচুর্য আসে তখন আগরাযওয়ালারা (মতলববাজরা) এগিয়ে আসে। এসে ইখলাসওয়ালাদের মধ্যে ইখতেলাফ সৃষ্টি করে। কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থা দেখা যাবে। তখন কী করতে হবে তা হযরত উসমান রাযি.-এর দাওর থেকে জানা যাবে। সেটা হচ্ছে তাহাম্মুল ও বরদাশত।

আগারযওয়ালারা হযরত উসমান রাযি.-কে খেলাফত ছেড়ে দিতে বলে। মুখলিসীনরা তাঁর কাছে এই বিদ্রোহীদের কতল করার অনুমতি চাইলেন। হযরত উসমান রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের খুন বইতে দিব না। মুখলিসীনরা বললেন, তাহলে তো জান বাঁচবে না। কাজেই রাস্তা একটাই–খেলাফত ছেড়ে দেয়া। তিনি বললেন, খেলাফতও ছাড়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলে গেছেন–

يَا عُثْمَانُ، إِنْ وَلَّاكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا، فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَّصَكَ اللَّهُ، فَلَا تَخْلَعْهُ، يَقُولُ: ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থ : হে উসমান! আল্লাহ যদি কোনদিন তোমাকে এই (খেলাফতের) দায়িত্বভার অর্পণ করেন, তারপর যদি মুনাফিকরা তোমাকে আল্লাহর পরিয়ে দেয়া সেই পোশাক খুলে নিতে চায়, তুমি সেটা খুলবে না, নবীজী কথাটি তিনবার বলেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা.নং ১১২, সুনানে তিরমিযী, হা.নং ৩৭০৫)

অর্থাৎ খেলাফত ছেড়ো না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার বিপরীত করা যাবে না। আজ অনেকে বলে, হযরত উসমান রাযি.-এর মধ্যে নাকি ক্ষমতার লোভ ছিল! (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পুরা করছিলেন। ব্যক্তিগত খাহেশ (ক্ষমতার লোভ) তাঁর বিলকুল ছিল না।

বলছিলাম, মাল আসার পর মালের লোভে ইখলাসওয়ালাদের মধ্যে মতলববাজরা ঢুকে পড়ে। ফলে ইখতেলাফ অনিবার্য হয়ে পড়ে। হযরত উসমান রাযি. সবকিছু তাহাম্মুল ও বরদাশত করতে থাকেন। এমনকি বরদাশত করতে গিয়ে তিনি জান পর্যন্ত দিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যার এটাই সমাধান।

কোন কোন সময় ইখতেলাফ যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন কী করতে হবে? তখন হযরত আলী রাযি.-কে অনুসরণ করতে হবে। হযরত আলী রাযি.-এর সময় আগরাযওয়ালাদের কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আগরাযওয়ালারা মুখলিসীনদের মধ্যে ঢুকে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে হযরত আলী রাযি. কী করলেন? দিল পরিষ্কার রাখলেন। তার দিলে প্রতিপক্ষের প্রতি দুশমনী ছিল না, আদাওয়াত ও শত্রুতা ছিল না। তার দিল ছিল ইকরামুল মুসলিমীনে পরিপূর্ণ।

তিনটি দৃষ্টান্ত

এক. হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষের এক সাথী এসে খবর দিল, 'তালহাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছি!' উত্তরে হযরত আলী রাযি. যা বলেছিলেন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেছিলেন, 'জেনে রাখ্, তালহা জান্নাতী আর তুই-ই জাহান্নামী। আর এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো সত্য সংবাদ।'

দুই. এক ব্যক্তি খানা খেতো হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর দস্তরখানে, আর যুদ্ধ করতো আলী রাযি.-এর পক্ষে। হযরত মুআবিয়া রাযি. জানতে পেরে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বড় সাদাসিধা জবাব দিল যে, 'খানা আপনার দস্তরখানে ভালো হয়, তাই খানা আপনার দস্তরখানে খাই, আর যুদ্ধ হযরত আলী রাযি.-এর ওখানে ভালো হয়, তাই ওই পক্ষে যুদ্ধ করি...।' হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন, 'ঠিক আছে ভাই! যুদ্ধ যেখানে ইচ্ছা করো, তবে খানা আমার দস্তরখানেই খেয়ো।'

দিল পরিষ্কার না থাকলে যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তারই দস্তরখানে খানা খাওয়ার কেউ সাহস পায়!? আবার প্রতিপক্ষের যোদ্ধাকে নিজের দস্তরখানে খানার অনুমতি দেয়!?

তিন. এই যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ মুসলমান শহীদ হন। একপক্ষের ষাট হাজার, আর অপরপক্ষের চল্লিশ হাজার। হযরত আলী রাযি. জয়যুক্ত হন। হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষের কেউ এসে বলল, পরাজিত পক্ষের বন্দীদেরকে গোলাম-বাঁদী বানানো হোক এবং তাদের মাল-সম্পদ গনীমতের মত বণ্টন করা হোক। হযরত আলী রাযি. বললেন, না, এটা করা হবে না। এটা তো জিহাদ না; এখানে তো উভয়পক্ষই মুসলমান। সুতরাং মহিলারা আযাদ থাকবে। আর নিহতদের মাল তাদের ওয়ারিশরা পাবে; এই মাল গনীমত হিসেবে বণ্টিত হবে না।

আপসের লড়াই কী জিনিস, হযরত আলী রাযি.-এর এই উত্তর না জানলে আমরা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মই হয়তো বুঝতে পারতাম না।

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

অর্থ : মুসলিমদের দু'টি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দিও এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা হুজুরাত- ০৯)

এর মর্ম হল, মুমিনদের দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে শরীয়ত অনুযায়ী মীমাংসা করে দেয়া। কোন পক্ষ শরীয়তের ফায়সালা না মানলে সেই বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় হকের পক্ষ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করা, যতক্ষণ না বিদ্রোহীরা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। ফিরে আসলে তাদেরকে জুড়ে দেয়া। জুড়ে গেলে আর শত্রুতা না রাখা। ফিরে আসলে তাদের সঙ্গে আদল ও ইনসাফের আচরণ করা।

আদল ও ইনসাফ কীভাবে করব? হযরত আলী রাযি.-এর জওয়াবে পাই যে, মেয়েরা আযাদ থাকবে, বাচ্চারা আযাদ থাকবে, মাল ওয়ারিশরা পাবে।

হযরত আলী রাযি. ও মুআবিয়া রাযি.-এর আপসে লড়াইকালীন শত্রুরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায়। রোম সম্রাটের পক্ষ হতে হযরত মুআবিয়া রাযি.-কে হযরত আলী রাযি.-এর মোকাবেলায় সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠানো হয়। হযরত মুআবিয়া রাযি. রোমসম্রাটকে যে জবাব দিয়েছিলেন তা মনে রাখার মতো। হযরত মুআবিয়া রাযি. রোমসম্রাটকে জানিয়ে দিলেন–'হে রোমের কুকুর! তুই যদি আলী রাযি.-এর মোকাবেলায় যুদ্ধে আসিস,

তাহলে আলী রাযি.-এর পক্ষ হতে তোর বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল রওয়ানা হবে, আমি হবো তার প্রথম সেপাই।'

জ্বী হ্যাঁ, তাদের মধ্যে আপসে ইখতেলাফ ছিল, কিন্তু দিলে দুশমনী ছিল না। দলীলভিত্তিক মতভেদ ছিল কিন্তু হিংসা ও বিদ্বেষ ছিল না। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে রায়ের ইখতেলাফ হতে পারে, কিন্তু দিল দয়া ও মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকবে। ইখতেলাফ পয়দা হলে আমীর সাহেবের মাধ্যমে ফায়সালা করানো। বর্তমানে (হযরতজী ইনআমুল হাসান রহ. তখন হায়াতে ছিলেন) আমাদের তাবলীগী সাথীদের আখেরী ফায়সালা হবে হযরতজী দা.বা.-এর মাধ্যমে।

শয়তান আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে দূরে সরাতে চায়। শয়তান বলে যে, এরাই তো আপসে লড়াই-ঝগড়া করেছে, এদেরকে কী অনুসরণ করবে? মনে রাখতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে আমাদেরকে দূরে সরানো শয়তানী চেষ্টা। পক্ষান্তরে কুরআন বলছে সাহাবা কেরামগণের এত্তেবা করতে–

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ

অর্থ: আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের (সাহাবায়ে কেরামের) অনুসরণ করে...। (সূরা তাওবা-১০০)

কুরআন সাহাবায়ে কেরামের সবকিছু ক্ষমা ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা ফাতহ-২৯)

এখন শয়তান চাচ্ছে আমাদেরকে তাদের থেকে দূরে সরাতে।

এক মজমা আমাকে প্রশ্ন করল, এখন কোন দাওর (যামানা) চলছে? আমি বললাম, তোমরাই বলো। একজন বলল, এটা দাওরে ফারূকী (অর্থাৎ উমর রাযি.-এর যামানা)। কারণ প্রচুর মাল আসছে। বললাম, না, মাল আসলেই দাওরে ফারূকী হয় না। সিদ্দীকী দাওর না আসলে ফারূকী দাওর আসতে পারে না। শুধু মাল আসলেই দাওরে ফারূকী হয় না। দীনের ব্যাপক বিস্তারের পর এমনি এমনিই মাল আসতে থাকবে। তখন দিলে মালের মহব্বত থাকবে না। পক্ষান্তরে এখন মাল আসছে কিন্তু দীন মিটছে। মাল এখন হারাম তরীকায় (বিভিন্ন ফিকিরের পর, সওয়াল ও ধোঁকার মারফত) আসছে। এখন আমাদের দিলে মালের মহব্বত ভরপুর। সুতরাং এটা দাওরে ফারূকী নয় বরং এটা দাওরে কারুনী। অতএব এখন হযরত মূসা আলাইহিমুস সালামের উসূল (দাওয়াতের মেহনত) চলবে।

অন্যজন বলল, এটা উসমানী দাওর। কারণ কামকরনেওয়ালাদের মধ্যে ইখতেলাফ হচ্ছে। বললাম, না, এটা দাওরে উসমানী না। কারণ, দাওরে উসমানীতে দু'দিকেই মুখলিসীন ছিল। ইখতেলাফ শুরু করিয়েছে আগরায-ওয়ালারা, মতলব-বাজেরা। পক্ষান্তরে এখন তো দু' দিকেই আগরায আর মতলববাজের জয়জয়কার। সুতরাং এটা দাওরে উসমানী নয় বরং এটা দাওরে শয়তানী। সুতরাং এখন হযরত আদম আলাইহিমুস সালামের উসূল চলবে। কান্নাকাটি ও দু'আ করতে হবে।

তারপর তারা আমাকে বলতে লাগল, তাহলে আপনিই বলুন, এটা কোন দাওর?

আমি বললাম, এটা সিদ্দীকী দাওর। চারিদিকে দীন মিটে যাচ্ছে। কাজেই জান-মাল কুরবান করে দাওয়াতের মেহনত করতে হবে।

এখন মাকামী কাজের কথা বলব। মসজিদওয়ার জামাআত বানানো। এ জামাআতের কাজ মাকামী কাজ করা। মাকামী কাজ হল–

১. সপ্তাহে দুই গাশত করা।
২. মাসে তিন দিন লাগানো।
৩. রোযানা মসজিদে তা'লীম করা।
৪. রোযানা ঘরে তা'লীম করা।
৫. রোযানা তিন তাসবীহ পুরা করা।
৬. রোযানা একবার মশওয়ারা করা।
৭. রোযানা আড়াই ঘণ্টা দাওয়াতের কাজে লাগানো। মসজিদওয়ার জামাআত এ কাজগুলো মজবুতির সাথে করবে। কারণ প্রত্যেক মসজিদকে মসজিদে নববী এবং প্রত্যেক এলাকাকে মদীনা মুনাওয়ারার নকশায় বানাতে হবে।

পাঁচটি তাশকীল

১. মসজিদওয়ার জামাআত তৈরি করা। এই জামাআতের কাজ হল–

ক. সাথীদের মধ্যে মেহনত ও মেহনতের ওয়াক্ত ভাগ করে দেয়া। উদাহরণত রোগী দেখা, জানাযায় শরীক হওয়া, তিনদিনের জামাআত তৈরি করা ও উসূল করা।

খ. মহল্লার শতভাগ লোককে নামাযী বানাবার মেহনত করা। দেখা যায়, ২৫ বছর ধরে গাশত হচ্ছে, কিন্তু নামাযীর সংখ্যা যেই সেই। কারণ গাশত হয় বাদ আসর। আর মহল্লার লোকজন কাজ থেকে ঘরে ফিরে বাদ ইশা। তাদের সাথে গাশতওয়ালাদের ২৫ বছরেও দেখা হয়নি। এটা কাজের গাশত হয়নি, হয়েছে বরকতের গাশত। সুতরাং বাদ ইশা যে জামাআতের মেহনতের যিম্মাদারী তারা ইশার পর ঘরে ফেরা ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরুষদেরকে বোঝাবে আর পর্দার ভেতর থেকে মাস্তুরাতরা শুনবে। ফলে ২৫ বছরে যে দায়িত্ব পালন করা হয়নি তা পালিত হবে।

২. মহিলা ও বাচ্চাদের দাওয়াতী যেহেন (মন-মানসিকতা) বানাতে হবে। পৃথিবীতে সংখ্যায় মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি, আর বাচ্চারা মহিলাদের চেয়ে বেশি। মহিলাদের যেহেন বানাতে ঘরে তা'লীম করতে হবে। আর মহিলা বাচ্চাদের যেহেন বানাবে।

৩. প্রতিটি চিল্লার জামাআত আযম করবে যে, কমপক্ষে দু'টি করে জামাআত বের করব, নয়তো ফিরব না। এভাবে ১০০ জামাআত যখন চিল্লা শেষে ফিরে আসবে তখন নতুন ২০০ জামাআত চলতে থাকবে। এই ২০০ জামাআত আবার কমপক্ষে ৪০০ জামাআত বের করবে। এভাবে চলতে থাকবে।

৪. পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিদেরকে পালাক্রমে জামাআতে পাঠানো। তাহলে যুগ যুগ ধরে একাজ চলতে থাকবে। পক্ষান্তরে সবসময় শুধুই আমিই যাই; অন্যকে পাঠাই না, তাহলে আমার অসুখ হলে কাজেরও অসুখ হবে, আমি মারা গেলে আমার ঘর থেকে কাজও মারা যাবে।

৫. এক বছরের জামাআত তৈরি করা, এরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য খুব টাকা-পয়সা নিয়ে আসুক। এমন না হয় যে, পয়সা নেই বলে পায়দল জামাআত। প্রতি মাসে প্রতি জেলা থেকে এক-একটি সালের জামাআত বের হওয়া। তাহলে প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে ৬৪টি সালের জামাআত বের হবে।

বয়ান-০২

তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৭, সোমবার বাদ ফজর। স্থান : কাকরাইল মসজিদ

মেরে মুহতারাম দোস্তো আওর বুযুর্গ!

খুলাফায়ে রাশেদীনের চার দাওরে (যামানায়) কিয়ামত পর্যন্ত ঘটিতব্য সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। এই চার দাওরের প্রত্যেকটিতেই একটি জিনিস পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল; এ ব্যাপারে চার দাওরের কোন দাওরেই কমযোরী ছিল না। তা হচ্ছে–আমার

ইচ্ছা পুরা হোক বা না হোক–আল্লাহর হুকুম পুরা করে দেয়া।

প্রথম দু'জন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর ফারূক রাযি. ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর। এ দু'জনকে শাইখাইন (মুরুব্বীদ্বয়) বলা হয়। আর পরবর্তী দু'জন অর্থাৎ হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি. ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা। এ দু'জনকে খাতানাইন (দুই জামাতাদ্বয়) বলা।

শাইখাইন আল্লাহর হুকুম পুরা করেন। তাদের যামানায় হালত অনকূল ছিল। অনুরূপভাবে হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি.-ও আল্লাহর হুকুম পুরা করেন। হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি. দুজনের কারও মধ্যেই ক্ষমতার বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। এঁরা দু'জনেই শহীদ হন। মোটকথা চার খলীফার চারজনই আল্লাহর হুকুম পুরা করার ব্যাপারে এক ও একাট্টা ছিলেন। আমরা শাইখাইনের যুগে পাই মেযাজে শরীয়ত। আর খাতানাইনের যুগে পাই হুদূদে শরীয়ত। মেযাজে শরীয়তের বৈশিষ্ট্য সাদেগী; এখানে হালালের হদ বা প্রান্তরেখা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে হুদূদে শরীয়তে পাই হালালের আখেরী হদ বা প্রান্তরেখা।

হযরত উমর রাযি.-এর সময় প্রচুর সম্পদ আসে। কিন্তু সাদেগী বজায় থাকে। তাঁর যামানায়–

ক. পাকা ঘর নির্মাণ করতে দেয়া হয়নি।

খ. মসজিদ পাকা করতে দেয়া হয়নি।

গ. এক দস্তরখানে দুই সালুন (তরকারী) একত্রিত হতে দেয়া হয়নি। (ঘি ও সালুন খাননি)।

ঘ. ঘরে দরজা ছিল না। যাতে যে কোন সময় লোকজন আসতে পারে।

হযরত আবূ বকর রাযি.-এর সাদেগী তথা অনাড়ম্বর জীবন যাপনের নমুনা দেখুন। একবার তিনি পানি পান করতে চাইলেন। মধুমিশ্রিত পানি দেয়া হল। তিনি পান করলেন না। তাঁর চোখে পানি চলে আসল। কেন? কারণ, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কো সাদেগী মাহবুব আওর মাতলুব থা।' (অনাড়ম্বর জীবন নবীজীর পছন্দ ও প্রিয় ছিল।)

যাই হোক, প্রথম দুই দাওরে পাওয়া যায় মেযাজে শরীয়ত। হযরত উমর রাযি. এক দস্তরখানে দুই তরকারী হারাম মনে করেননি। বরং উম্মতের মেযাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাদের জীবন সহজ ও অনাড়ম্বর হয়।

পক্ষান্তরে হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আলী রাযি.-এর যুগে পাকাঘর, পাকা মসজিদ, একাধিক তরকারী, ভাল খাবার, ভাল কাপড়, ভাল বাসস্থান ইত্যাদির অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তাঁরা নিজেরা সাদেগীর এহতেমাম করেন। তবে অন্যদের ব্যাপারে পাবন্দী করেননি। ফলে লোকেরা বুঝল–

আদব তো সেটাই, যা আগের দু'জন করেছেন এবং যার উপর এ দু'জন ব্যক্তিগতভাবে আমল করছেন, কিন্তু আমরা যা করছি তা-ও জায়েয। এতে উম্মতের জন্যে সহজতা সৃষ্টি হয়েছে। চারজনই একরকম হয়ে গেলে মানা জরুরী হয়ে যেতো। এখন জায়েযটাও উম্মতের সামনে আসল।

উদাহরণত নবীজী খুতবা দেয়ার সময় মিম্বরের যে ধাপে দাঁড়াতেন হযরত আবূ বকর রাযি. এক ধাপ নেমে দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়াতেন। হযরত উমর রাযি. তার যামানায় আর এক ধাপ নেমে তৃতীয় ধাপে দাঁড়াতেন। হযরত উসমান রাযি. স্বীয় খেলাফতকালে প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে গেলেন। এখন আমাদের মতো লোকের চোখে তার এ আচরণ কেমন কেমন লাগবে। আসলে তিনি হুদূদে শরীয়ত দেখিয়ে উম্মতের উপকারই করলেন। তিনি যদি এরকম না করতেন, আজ নামতে নামতে আমাদেরকে কূপে নেমে খুতবা দিতে হত!

আল্লাহ হযরত উসমান রাযি.-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন, তিনি উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

একলোক খানা খাওয়ার পর পাঁচ রকম ফল খেতো। জামাআতে এসে তিন রকম ফল খেতে শুরু করল। আমি বললাম, মাশাআল্লাহ! মুজাহাদার পথে এগোচ্ছো।

আমার একথা শুনে আরেকজন, যে আগে ফলই খেতো না, এখন এক প্রকার ফল খেতে শুরু করল। আমি বললাম, তুমি মুজাহাদার লাইনে নিচের দিকে যাচ্ছো। সে বলল, সে-তো তিন রকমের খায়?! বললাম, তার জন্যে এটাই মুজাহাদা। আরে, আমেরিকার নতুন মুসলমান তো হারাম থেকে হালালের গণ্ডিতে এসে এতো ভাল ভাল খাবার খায়। সে হারাম থেকে হালালের সীমানায় এসেছে, আমি যেন সেই হালালের সীমান্তে না যাই। এতে আমার হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

অর্থ : এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, সুতরাং তোমরা এগুলোর কাছেও যেও না, এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে স্বীয় নিদর্শনাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। (সূরা বাকারা- ১৮৭) –এই আয়াতে সীমানার কাছেও যেতে মানা করা হয়েছে। এখানে আসলে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ : এটা আল্লাহর স্থিরকৃত সীমা, তোমরা এটা লংঘন করো না, যারা আল্লাহর সীমা লংঘন করে, তারা বড়ই যালেম। (সূরা বাকারা- ২২৯) –এই আয়াতে সীমানা পার হতে মানা করা হয়েছে। সীমানা পার হওয়া হারাম। এখানে ফাতওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সর্বোত্তম হল, মেযাজে শরীয়তের উপর থাকা। সাদেগী অবলম্বন করা, তাকওয়ার উপর চলা। মাঝামাঝি থাকলেও চলে, তবে সীমানা রক্ষা করা ফরয।

কাম-করনেওয়ালা সাথীরা মেযাজে শরীয়তের উপর চলার চেষ্টা করবে। অনেক সাথী বিদেশ সফর করে এসে সাদেগী বাদ দেয়। এটা কুফল। মেযাজে শরীয়তের উপর না চললে হালাল থেকে বের হয়ে হারামে চলে যাওয়ার আশংকা আছে। ঠিক যেমন একটা গরু মালিকের জমিতে ঘাস খেতে খেতে আইলের দিকে এগোতে শুরু করে। তো আইলের দিকে এগোতে থাকা গরুটির ব্যাপারে মালিকের জমি থেকে বের হয়ে অন্যের জমিতে চলে যাওয়ার আশংকা আছে। এজন্য জমির মাঝে থাকাই নিরাপদ।

নিজে তো মেযাজে শরীয়তের উপর চলার চেষ্টা করবে, কিন্তু কেউ মেযাজে শরীয়তের উপর না চললে তাকে ভালো-মন্দ বলব না, তার ভুল ধরব না। আমাদেরকে তো দারোগা করে পাঠানো হয়নি। হ্যাঁ, উমুমীভাবে তারগীব দেবো, উৎসাহ দেবো, কিন্তু তাগিদ দিব না। কেননা, হুদূদে শরীয়তের উপর চলার অনুমতি না দিলে নতুনদের কাজে আসা সম্ভব হয় না।

এক হচ্ছে তাকওয়া, আর আরেক হচ্ছে ফাতওয়া। তাকওয়া হচ্ছে মেযাজে শরীয়ত, আর ফাতওয়া হচ্ছে হুদূদে শরীয়ত। যে হুদূদ লঙ্ঘন করে সে যালেম। তবে আমাদের উচিত তাকওয়া-ওয়ালা যিন্দেগীর উপর ওঠা। নতুন মানুষ ফাতওয়ার উপর চলতে চাইবে।

তাদেরকে সুযোগ দেয়া; কঠোরতা না করা।

এক হাজী সাহেবকে বলেছিলাম, এত জাঁকজমক ভাল না। তিনি প্রশ্ন করলেন কেন? ফ্রিজে রেখে ফল ঠাণ্ডা করে খাওয়া কি হারাম? ভাল কাপড়, ভাল খাবার এসব হারাম? বললাম, আমি হারাম বলি না, তবে আপনি মরে গেলে আপনি পরিবারের লোকজন হুদূদের বাইরে চলে যেতে পারে। কারণ আপনি নিজে এখনই হদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।

ঐ লোক এক বছর পর নিযামুদ্দীনে এসে খুব কাঁদলেন। বললেন, আমার মরার পর না, বেঁচে থাকতেই আমার ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে, যিনা করে ইত্যাদি।

কতগুলো মওকা আসে যা কাজে লাগালে অনেক আগে বাড়া যায়। আর মওকা হাতছাড়া হলে অনেক পিছিয়ে যেতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা 'তেকান্না' (গোঁ-ধরে বসে থাকা) মেযাজ থেকে হেফাযত করুন। আমাদের মেযাজ 'চৌকান্না' (পরিস্থিতি বিবেচনায় কাজ করা) হওয়া দরকার।

এক খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে তেকান্না মেযাজের পাল্লায় পড়ল। তাকে ইসলাম গ্রহণ করিয়েই মাগরিব ৫ রাকআত, আওয়াবীন ৬ রাকআত, ইশা ১৭ রাকআত, তারাবীহ ২০ রাকআত, তাহাজ্জুদ ১২ রাকআত পড়িয়ে পরদিনের জন্যে সাহরী খাওয়ানো হল। চাপে পড়ে নওমুসলিম বেচারা ইসলামই ত্যাগ করে বসল। অথচ তাকে মাগরিব ৫ রাকআত আর ইশা ৯ রাকআত পড়িয়ে শুইয়ে পড়তে বললেই হত। নওমুসলিমকে প্রথমদিনেই আওয়াবীন পড়ানোর দরকার ছিল না। তারাবীহ পড়ানোর দরকার ছিল না।

অনেকে মামুলী জিনিস নিয়ে খুব উসূল, উসূল করে। মৌলিক উসূলের পাবন্দী তো করতেই হবে, তবে আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কাজ করা চাই। ঘরে পর্দা-পুশিদার বালাই নেই, কিন্তু তা'লীমে একটু ভুল হল কি তুফান শুরু হয়ে গেল, হায়! হায়! উসূল ভেঙ্গে গেল! আবার ঈসা আলাইহিস সালামের পেশাব পাক নাকি নাপাক এ নিয়ে দলাদলি হয়ে গেল! মামুলী জিনিস নিয়ে সময় নষ্ট না করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচান। আমীন!

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, কাজ হচ্ছে না, কিন্তু মনে করছে যে, খুব কাজ হচ্ছে! এটা বড় হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর কথা। আমি বড় হযরতজীকে দেখিনি। মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. তার সোহবতে ছিলেন। আমি মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. কাছ থেকে একথা শুনেছি।

আসল কাজ হচ্ছে নিজের মধ্যে ছয় সিফাত আনা। তো এটা আসছে না; আবার মনে করা হচ্ছে যে, খুব কাজ হচ্ছে। এটা ভয়ের কথা, সবচেয়ে ভয়ের কথা। অন্যের দীনদার হওয়া, আর নিজে দীনদার হওয়া এক কথা নয়। নিজে দীনদার হওয়া পয়লা কাজ। সমস্ত দুনিয়া আমার হয়ে গেল, কিন্তু আমি আল্লাহর হলাম না, তো আমার কী হলো!?

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহ. পুরানাদের মজমায় একথা বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা কখনও ফাসেক-ফাজের এমনকি কাফের দ্বারাও দীনের প্রসার ঘটান, কিন্তু জান্নাতে যাবে শুধুই ঈমানদার।' তাই নিজের সম্বন্ধে বে-ফিকির না থাকা।

গাশতের আদব বলতে বলতে সময় শেষ। তো গাশত কখন করব? গাশতও তো করা দরকার। মাছ এত ছোট অথচ লেজ এত লম্বা! এটা দুঃখজনক!

একবার তা'লীম করতে গিয়ে হযরতজী মাওলানা ইন'আমুল হাসান সাহেবসহ কয়েকজন মুরুব্বী অনেকক্ষণ ধরে তা'লীমের আদব বলতে থাকেন। বড় হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ. দরজায় করাঘাত করে বকাঝকা করেন যে, কী শুরু করলে! তা'লীম তো শুরু করো!

বড়দের তাম্বীহ ও সতর্ককরণ আমাদের জন্য বহুত বড় নেয়ামত। এজন্য আমাদের মতের বিপরীত হলেও আমরা বড়দের তাম্বীহ ও সতর্ককরণ আমলে নিয়ে তাদের সাথে জুড়ে যাব। হযরত উসামা রাযি.-এর প্রসঙ্গে হযরত উমর রাযি. কর্তৃক হযরত আবূ বকর রাযি.-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ায় উম্মতের খায়ের ও কল্যাণই সাধিত হয়েছে।

হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রাযি.-এর মধ্যে ১৯-২০ এর পার্থক্যছিল। একবার হযরত উমর রাযি. নামায পড়াতে শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'লা, লা, ইল্লা আবা বাকর।' অর্থাৎ উমর নয়, লোকেরা আবূ বকর রাযি.-এর পেছনে ইক্তেদা করবে। আচ্ছা, হযরত উমরের পিছনে পড়লে কি নামায হতো না? হতো, কিন্তু আগেরজন ছেড়ে পরেরজন না। এটাই তরতীব। কারণ ০৯:১৯-এর ট্রেন ০৯:২০ মিনিটে এক মাইল চলে যেতে পারে।

অনুরূপ ০৯:১৯-এ ফাঁসি কার্যকর করা হল, আর কেউ ০৯:২০-এ খালাসির পরোয়ানা নিয়ে হাজির হল! তো এতে কী লাভ হবে? সুতরাং এসব ক্ষেত্রে 'এটা কী হারাম?' এমন প্রশ্ন না করা। উনিশ-বিশ- এর পার্থক্যও বড় পার্থক্য।

কথাগুলো এজন্য বললাম যে, বলা না হলে রি-অ্যাকশন-এর আশঙ্কা আছে। মুযাকারা না করা হলে যার যেমন ইচ্ছা গাশত করতে শুরু করবে। এজন্য মুযাকারার দরকার আছে।

মুযাকারা না হলে গাশতে গিয়ে মহিলাদের দিকে তাকাবে, দুনিয়াবী কথা বলবে। তবে মুযাকারা এত লম্বা না হয় যে, কাজই হয় না; আবার কাজ এত লম্বা না হয় যে, মুযাকারারই সময় নেই।

যেখানেই যাবো, মসজিদওয়ার জামাআত বানাবো। মসজিদওয়ার জামাআত বানানোর অর্থ হল প্রতি মসজিদে কমপক্ষে ১০ জনকে মজবুত দাঈ বানানো।

আগে আমভাবে জিহাদের উসীলায় দীনের প্রসার হতো। এরপর প্রসার হতো পায়দল হজ্জের উসীলায়। তখন ৬ মাস লাগতো যেতে, আর ৬ মাস লাগতো আসতে। এভাবে জিহাদ ও হজ্জের সফরকালীন মুসলমানদের দাওয়াত, তা'লীম ও আখলাক দেখে দেখে অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করতো। বর্তমানে জিহাদের রাস্তা অতটা আম ও ব্যাপক নয় যতটা আগে ছিল। আর হজ্জ হয়ে গেছে উড়োজাহাযে। তাই এখন বিকল্প হচ্ছে পায়দল সালের জামাআত। আল্লাহ আবার রাস্তা খুলেছেন। আমরা এটাকে গনীমত মনে করি। সালের জামাআতগুলো সারাদেশে মসজিদওয়ার জামাআত তৈরি করবে। যাতে দেশের সমস্ত মসজিদ মসজিদে নববীর নকশার উপর এসে যায় এবং সমস্ত শহর ও বসতি মদীনা মুনাওয়ারার নকশার উপর এসে যায়!

[বি.দ্র. আয়াত-হাদীসসমূহের ইবারাত-হাওয়ালাহ অক্ষরবিন্যাসকারী কর্তৃক সংযোজিত ও অনূদিত। অক্ষরবিন্যাসকারী- অত্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শা'বান-২০০২, ২০১২ ও ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে হিফয, দাওরা ও ইফতা সমাপনকারী মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম (বয়ান লেখকের মেজো সাহেবযাদা)]

বড়দের সান্নিধ্যে বরকতময় কিছু সময়

মুফতী সাঈদ আহমাদ

মোমেনশাহী শহর বড় মসজিদ সংলগ্ন জামি'আ ফয়জুর রহমান রহ.-এর মুরুব্বীগণ গত ১৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে দু'টি দীনী প্রোগ্রামের ইন্তিযাম করেছিলেন। এক. ব্যাংক-বীমা বিষয়ক সেমিনার; সময় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দুই. তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বয়ান; সময় বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। উভয় প্রোগ্রামের জন্য তারা শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.-কে দাওয়াত করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সে সূত্রে হযরতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বড় মসজিদের শ্রদ্ধেয় ইমাম ও খতীব, জামি'আ ফয়জুর রহমান রহ.-এর স্বনামধন্য মুহতামিম, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর সুযোগ্য খলীফা, বড় হুযূর হযরত হাফেয মাওলানা আব্দুল হক সাহেব দা.বা.। হযরত মুফতী সাহেব হুযূর পূর্ব নির্ধারিত লাগাতার প্রোগ্রামের কারণে দাওয়াত গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং তারা মুনাসিব মনে করলে এ অধমকে ডেকে নেয়ার পরামর্শ দিলেন। অধম সফরে অনভ্যস্ত এবং মুফতী সাহেব হযরতের বিকল্প হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি কারণে মোমেনশাহীর প্রতি ভিন্ন আগ্রহ বুকে লালন করছিলো। কাজেই বড় হুযূর দা.বা. যখন ফোন করে বললেন, আমি মোমেনশাহী বড় মসজিদের হাফেয আব্দুল হক বলছি; আপনি আগামী রবিবার আমাদের বড় মসজিদে আসবেন এবং দু'টি প্রোগ্রামে কিছু আলোচনা করবেন। আমি বললাম, হুযূর! আলোচনার জন্য নয়; আমি ইনশাআল্লাহ দু'আ নেয়ার জন্য আসবো। হযরত বললেন, আসেন; আমরা দু'আ দিবো ইনশাআল্লাহ। ফোনে কথা শেষ করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলাম যে, এক উসীলায় দীর্ঘ দিনের কয়েকটি তামান্না পূরণ হবে হয়তো!

১৭ মার্চ বাদ ফজর হেলাল ভাইয়ের গাড়িতে চড়ে রওয়ানা হলাম। সাথে ছিলো হাফেয মাওলানা আযীযুল হক মোমেনশাহী। সে ১৬ মার্চ রাবেতার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ায় এসেছিলো। যানজট শুরু হওয়ার আগেই জয়দেবপুর চৌরাস্তা পার হলাম। মাওনা ব্রিজের প্রায় পাঁচ কি.মি. আগে হেলাল ভাই বললেন, সামনে মহাসড়কের পাশেই আপনাদের এক ছাত্রের মাদরাসা; ওখানে নামবেন কিনা? আমার সম্মতি পেয়ে তিনি আরো এক কি.মি. অগ্রসর হয়ে গরগরিয়া মাস্টার বাড়ি গিয়ে গাড়ি থামালেন।

মহাসড়ক ঘেঁষেই তা'লীমুস সুন্নাহ আল-ইসলামিয়া মাদরাসার সীমানা। লম্বা টিনশেড। ভেতরে প্রবেশ করতেই ডানপাশে অস্থায়ী নামাযঘর, বামপাশে পরিপাটি অফিস কক্ষ। অতঃপর হিফয, নাযেরা ও নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষ। শেষ মাথায় স্থায়ী মসজিদের জন্য নির্মাণাধীন ভিত্তিপ্রস্তর।

তালিবুল ইলমগণ পড়াশোনায় ব্যস্ত। শিক্ষকগণ নিগরানী করছেন। কেউ পড়াচ্ছেন। আমাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে নিকটস্থ বাসা থেকে বাইকযোগে ছুটে এসেছেন মাদরাসার মুহতামিম সাহেব জামি'আ রাহমানিয়ায় ২০০৭ সালে শিক্ষাসমাপনকারী মাওলানা ইন'আমুল হাসান। মাদরাসাটি মাওলানা ইনআমুল হাসানের পিতা মাওলানা কাজী আব্দুল হাই সাহেব তার নিজস্ব জমিতে ২০১৫ সালের ২৬ মে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাত্র এক বছরের মাথায় ২০১৬ সালের ১৫ মে তিনি ইন্তিকাল করেন। অতঃপর ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে ইনআমুল হাসানের মাতাও ইন্তিকাল করেন। উভয়ে মাদরাসার অস্থায়ী মসজিদের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে। বড় খোশনসীব তাদের! মরণোত্তর তারা একই সঙ্গে নেক সন্তান, ইলমে দীন ও সদকায়ে জারিয়ার তিন-তরফা সওয়াব লাভ করছেন।

আমরা এখানে নেমেছি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য; কিন্তু ইতোমধ্যে মাওলানা সাহেব আমাদের জন্য নাস্তার ইন্তিজাম করে ফেলেছেন। ঘরোয়া আয়োজন; সেদ্ধ আটার রুটি, ডিম ভাজি ও গরুর গোশত ভূনা। এমন তড়িৎ ব্যবস্থাপনায় মেশিনও হার মানার কথা! তার আন্তরিকতা, আবেগ ও আবদারে মন চাচ্ছিল অনেকক্ষণ তার সঙ্গে থাকি। কিন্তু ১০টার আগেই মোমেনশাহী শহর পৌঁছতে হবে। অগত্যা মনের আশা অপূর্ণ রেখেই বিদায় নিলাম। সজল নয়নে সে আমাদেরকে বিদায় দিল। আল্লাহ তা'আলা তার মাদরাসা তা'লীমুস সুন্নাহকে ভরপুর কবূলিয়াত দান করুন; আমীন।

নবনির্মিত মোমেনশাহী মহাসড়ক। গাড়ি চলছে দ্রুত গতিতে। সকাল নয়টা পার করে শহরে প্রবেশের পূর্বে দারুল উলূম নেযামিয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের গাড়ি বামে মোড় নেয়। সাড়ে নয়টার দিকে নেযামিয়ায় পৌঁছি। নেযামিয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা আমীনুল হক সাহেব আমাদের সফরসঙ্গী মাওলানা আযীযুল হকের আপন ফুফা, আর তালিবুল ইলমির যামানায় আমার শ্রদ্ধেয় পিতার স্নেহধন্য ছাত্র। মাওলানা আযীযুল হকের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুহতামিম সাহেব অফিস কক্ষে অপেক্ষমান। মুহতামিম সাহেব বয়সের বিচারে ততোটা প্রবীণ না হলেও দারুল উলূম নেযামিয়ার পুনঃগঠনে যে ত্যাগ ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলছেন তাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রবীণদের তালিকায় স্থান করে নিচ্ছেন। পাঁচ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত মনোরম পরিসর। ছাত্রদের উযূ-গোসলের জন্য স্বচ্ছ পানির বিশাল পুকুর। পড়াশোনার সুমধুর শব্দে মুখর লম্বা লম্বা টিনশেড। পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর। ৫১৫ জন ছাত্র ২৬ জন শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নরত। একপাশে নির্মাণাধীন ৪তলা বিশিষ্ট নতুন মসজিদের দুই তলার ছাদের কাজ শেষ হয়েছে। প্রতি তলার আয়তন ৯৩৭৫ বর্গফুট। অপর পাশে নির্মাণাধীন ৭তলা বিশিষ্ট শিক্ষাভবন ও একাডেমিক ভবন। এটিরও সম্ভবত দু'টি তলা নির্মিত হয়েছে। প্রতি তলার আয়তন ১৮৭২৪ বর্গফুট। আরেক দিকে রয়েছে বিশাল আয়তনে ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা। নির্মাণাধীন ভবনগুলোর কক্ষবিন্যাসে রয়েছে দূরদর্শিতা ও দক্ষ চিন্তা-ভাবনার ছাপ। কাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গভীর নযরদারী, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবসম্মত আকাশচুম্বী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নেযামিয়া এক বিশাল মহীরুহ।

এককভাবে এত ইন্তিজামের কথা কল্পনা করলেই দু'কান ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি তাঁর অন্দরমহলেও চলছে দীনী খিদমতের নীরব প্রতিযোগিতা। মহল্লার মেয়েদের জন্য মাওলানা আযীযুল হকের ফুফুর মাধ্যমে বাসার ভেতরে চলছে মকতব, হিফযখানা ও বয়স্ক মহিলাদের দীনী শিক্ষাদান। তাদের পড়ালেখার জন্য রয়েছে দেয়ালঘেরা সুন্দর পরিবেশ। যাতায়াতের জন্য আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবেশপথ। এখানেও রয়েছে অনুকরণীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। হযরত মুহতামিম সাহেব ১৯৯৯ সালে নেযামিয়ায় যোগদান করেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে মাত্র ২০ বছরে তিনি দারুল উলূম নেযামিয়াকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন, যেখানে পৌঁছতে এক বিরাট গোষ্ঠী কিংবা কয়েক প্রজন্মকে অক্লান্ত শ্রম দিতে হয়। আল্লাহ তা'আলা হযরতের হায়াতে আরো বরকত দান করুন। তার সকল অসম্পন্ন প্রকল্পকে সম্পন্ন করার এবং পরিকল্পিত মিশনগুলোকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের সকালের নাস্তা নেযামিয়াতেই করার কথা ছিলো। সে হিসেবে নাস্তার আয়োজন চলছে। এ অবসরে তিনি আমাদেরকে মাদরাসার নির্মাণাধীন ভবনগুলো দেখালেন এবং কিছু কিছু পরিকল্পনার কথা শোনালেন। দেখে-শুনে মনে হলো, তার কাছ থেকে দেশের আলেমদের অনেক কিছু শেখার আছে। আল্লাহর উপর ভরসা ও সৎসাহসিকতাই যে সাফল্যের মূলমন্ত্র তার সুবিশাল কৃতিত্ব এ কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়।

প্রায় দশটা বেজে গেছে। দস্তরখান প্রস্তুত। হালকা নাস্তা পূর্বেই হয়ে গেছে। ফলে গরুর কলিজাভুনা, মুরগী ভাজা, ডিমভাজি ও সবজিসহ বিভিন্ন লোভনীয় পদ থাকা সত্ত্বেও একটুকরো, একচামচ করে গ্রহণ করলাম। নাস্তা শেষে বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমার সন্তানাদিসহ পরিবারের সকলের জন্য দু'আ দিয়ে বিদায় জানালেন।

এদিকে মোমেনশাহী বড় মসজিদে ব্যাংক-বীমার সেমিনারে অংশগ্রহণ-কারীরা অপেক্ষা করছেন। ফোনে আমাদের সংবাদ নিচ্ছেন বড় হুযূরের সুযোগ্য সন্তান মাওলানা আবূ দুজানা। বড় মসজিদে আমাদের পৌঁছতে সাড়ে দশটার বেশি বেজে গেলো। ভেবেছিলাম, আরো কয়েকজন আলোচক আছেন, যারা অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু গিয়ে দেখি, আলোচক মাত্র আমিই। সকলে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। লজ্জিত হলাম।

অপরদিকে জামি'আর অফিস কক্ষে উস্তাদগণ ফল-ফলাদি ও চা-নাস্তা নিয়ে বসে আছেন। হুকুম রক্ষার্থে দস্তরখানের সামনে বসলাম। বেদানার কয়েকটা দানা মুখে নিলাম। অতঃপর জরুরত সেরে জামি'আর প্রধান মুফতী সাহেব আমাকে নিয়ে বড় মসজিদের ভেতরে গিয়ে মিম্বরে বসতে বললেন। হযরত মুফতী সাহেব বসলেন পাশের চেয়ারে। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে আলোচনা শুরু করলাম। তাঁরই মেহেরবানীতে যোহরের আযান পর্যন্ত আলোচনা হলো। প্রচলিত ও তথাকথিত ইসলামী ব্যাংক-বীমার মাসায়িল এবং বাস্তব অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করেছিলাম, মজলিসে ব্যাংক-বীমার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু পরে জানলাম, নবীন উলামা ও উচ্চস্তরের তৃলাবাগণকেই সে দিনকার মজলিসের শ্রোতা হিসেবে একত্র করা হয়েছিলো।

যোহরের আযান হলো। বড় হুযূর দা.বা. তাশরীফ আনলেন। সালাম-মুসাফাহা ও কুশল বিনিময়ের পর তিনি নামায পড়ালেন। নামাযান্তে দুপুরের খাবার। খাবার শেষে বড় হুযূর আমাদেরকে কিছু সময় কিছু আবেদন-নিবেদনের সুযোগ দিলেন এবং বললেন, বাসায় লাউড-স্পিকার সংযোগ আছে; আমি শুয়ে থেকে আপনার আলোচনা শুনেছি। ইসলামের নামে প্রচলিত ব্যাংক-বীমার ব্যাপারে আপনি যে মতামত উল্লেখ করেছেন, আমিও এমনটাই মনে করি।

প্রসঙ্গক্রমে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ., জামি'আ নূরিয়া, জামি'আ কুরআনিয়া লালবাগ ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ও তাঁদের শিক্ষাজীবনের কিছু স্মৃতিচারণও হলো। শেষপর্যায়ে যখন আমার সন্তানদের বিশেষ করে ছেলের সুস্থতার জন্য দু'আ চাইলাম, তখন তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর বরাতে একটি আমলের কথা বললেন– হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, হযরত! আমি অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ। কোন ওষুধেই সুস্থ হচ্ছি না। হাকীমুল উম্মত তাকে বললেন, আপনি اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ দু'আটি নিয়মিত পড়তে থাকুন। কিছুদিন পর লোকটি এসে জানালো, হযরত! এই দু'আর বরকতে আল-হামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছি।

অতঃপর বড় হুযূর আরেক বুযুর্গের ঘটনা শুনালেন– এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, হযরত! পরিবারের সকলেই অসুস্থ, কী করবো, পরামর্শ দিন। বুযুর্গ বললেন, الحمد للہ کچھ گریہ زاری کا موقع مل گیا (আল্লাহর শোকর যে, কিছু কান্নাকাটির সুযোগ পেলে গেলে)। বান্দা যখন বিপদে পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে এতেও তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পরকালীন বিনিময়ের বিচারে অসুখ-বিসুখও আল্লাহ প্রদত্ত অনেক বড় নেয়ামত। দুনিয়া তো কষ্টেরই জায়গা। কিছু কষ্ট ইচ্ছাধীন, আর কিছু অনিচ্ছাকৃত ও অপ্রত্যাশিত। আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে দু'টোই লাভজনক।

কথায় কথায় পরবর্তী মজলিসের সময় হয়ে গেল। আরজ করলাম, 'হুযূর! এ মজলিস ৪টা পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা শেরপুর নকলা থানায় আমাদের সফরসঙ্গী হেলাল ভাইদের গ্রামে যাবো। সেখানে মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত কিছু দীনী আলোচনা হবে। বাদ ইশা ঢাকার উদ্দেশ্যে ওয়াপস রওয়ানা হবো।' শুনে তিনি খুশি হলেন এবং বললেন, দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু বেড়ানোর জন্য সফর করা অনুচিত। বললেন, আমি দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া কোন দাওয়াত গ্রহণ করি না। এমনকি এক কাপ চায়ের দাওয়াতও না।

হুযূরের এ সকল মূল্যবান কথায় আমরা খুবই উপকৃত হলাম। অতঃপর অনুমতি নিয়ে মসজিদে অপেক্ষমান তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। মজলিসে পৌঁছার পূর্বে জনাব মুফতী সাহেব ফাতাওয়া বিভাগে নিয়ে গেলেন। সেখানে দু-চার কথা বলার তাওফীক হল। সেখান থেকে বের হয়ে তালিবুল ইলমদের মজলিসে আল্লাহর ফযলে এক ঘণ্টার অধিক সময় কথা বলা হল। অতঃপর সংক্ষিপ্ত দু'আ করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেরপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

শম্ভুগঞ্জ মোড়ে পৌঁছে মাওলানা আযীযুল হক তার বাড়ি যাওয়ার জন্য আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলো। এখন আমি আর হেলাল ভাই। পথিমধ্যে আসর আদায় করে মাগরিবের আযানের প্রায় ১৫/২০ মিনিট পর আমরা হেলাল ভাইদের গ্রামে পৌঁছলাম।

(২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সোনালী সময় আবার এসেছে ফিরে

মাওলানা সাঈদুর রহমান মুমিনপুরী

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আমাদের পুরো জীবনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের আবদিয়্যাত ও বন্দেগীর হক আদায় করতে থাকা। তদুপরি আল্লাহ পাকের মহান অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের ইবাদত ও বন্দেগীর এমন কিছু সোনালী পর্ব দান করেছেন, যেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে আমরা অল্প সময়ে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হতে পারি। আমাদের সামনে পর্বগুলো উপস্থিত। শুধু প্রয়োজন সচেতন হওয়া। শুধু প্রয়োজন জেগে ওঠা। শুধু প্রয়োজন রূহানী ক্ষুধা অনুভব করতে শেখা। আসুন নিজেদের জাগিয়ে তুলতে জানা বিষয়গুলো আমরা আবার একটু পড়ে নেই।

শবে বরাত

আরবীতে বলা হয় 'লাইলাতুল বারাআহ' বা মুক্তির রজনী। এই রাত মুক্তি ও ক্ষমার রজনী। আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহের রাত্রি। শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্রি। যে রাতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করেন এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। তবে শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারীকে ক্ষমা করেন না। এ বিষয়ে সনদের বিচারে সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা সেটা, যা ইবনে হিব্বান রহ. কিতাবুস সহীহতে (হা.নং ৫৬৬৫) বর্ণনা করেছেন–

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أومشاحن.

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অর্ধ শা'বানের রাতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তার সমগ্র সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।

শাইখ আলবানী রহ. প্রথমত এই হাদীসকে সহীহ বলেন। তারপর এই হাদীসের সমর্থনে আরও আটটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, মোটকথা এই সকল বর্ণনার সমষ্টিসহযোগে হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ। (সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯)

শাইখ আলবানী রহ.-এরপর বলেন,

ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق

যদি কেউ এ জাতীয় কথা বলে থাকে (যে, মধ্য শা'বানের রাতের ফযীলত সংক্রান্ত কোন সহীহ হাদীস নেই), তাহলে নিশ্চয় এমনটি তাড়াহুড়া বা হাদীসের সূত্রগুলো অনুসন্ধানে যথাযথ শ্রম ব্যয় না করার কারণে বলে থাকবে। (সিলসিলাতুস সহীহাহ ৩/১৩৯)

এছাড়া এ রাতের আমল সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী সংকলিত শু'আবুল ঈমান গ্রন্থের নিম্নলিখিত হাদীসটি লক্ষণীয়। হযরত 'আলা ইবনুল হারিস রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তখন তা নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায থেকে ফারেগ হলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! অথবা বলেছেন, ও হুমায়রা! তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা দেখে আমার আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم.

এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ-পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। (শু'আবুল ঈমান, হা.নং ৩৫৫৪, ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, هذا مرسل جيد অর্থাৎ এটি জায়্যিদ [গ্রহণযোগ্যতার একটি স্তর] মুরসাল মানের হাদীস।)

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, এই রাতে দীর্ঘ সিজদায় দীর্ঘ নফল নামায পড়া শরীয়তে দৃষ্টিতে কাম্য। তবে বর্তমানে বিভিন্ন অনির্ভরযোগ্য বইপুস্তকে যে বিভিন্ন পদ্ধতির নামাযের উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এত রাকআত নামায পড়লে এই নেকী, এভাবে পড়লে এই নেকী, এগুলোর শরয়ী ভিত্তি নেই। বরং স্বাভাবিক নফল নামাযের মতই দুই দুই রাকআত করে যতক্ষণ আগ্রহ হয় আদায় করবে। সে সাথে দু'আ, তিলাওয়াত ও ইস্তিগফারের প্রতি বিশেষ মনোযাগ দিবে এবং প্রয়োজনমত ঘুমিয়ে নেবে। এমন যেন না হয়, দীর্ঘ ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ফজরের নামায আদায় করতেই কষ্ট হয়ে গেল।

পরদিন রোযা রাখা

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ...

যখন মধ্য শা'বানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) উপস্থিত হয়, তখন তোমরা রাতে ইবাদত-বন্দেগী কর আর দিনে রোযা রাখো...। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৩৮৮)

এই বর্ণনাটির সনদ যদিও যয়ীফ; কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এ জাতীয় যয়ীফ হাদীস আমলযোগ্য। তাছাড়া শা'বান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং মধ্য শাবান 'আইয়্যামে বীয' (প্রত্যেক চান্দ্রমাসের ১৩-১৪-১৫ তারিখ) -এরও অন্তর্ভুক্ত।

আর আইয়্যামে বীযে রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

শবে বরাতে বর্জনীয় বিষয়াদি

এই রাতে বিভিন্ন ধরনের রসম-রেওয়ায তথা হালুয়া-রুটি, আতশবাজি, পটকাবাজি, দলবেঁধে ঘোরাঘুরি ইত্যাদির প্রচলন দেখা যায়। এই রাতকে কেন্দ্র করে এসব কর্মকাণ্ডের কোন ভিত্তি নেই। তাই এসব বর্জনীয়। এসব বাদ দিয়ে মূল কাজ তথা সাধ্যমত ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া কর্তব্য।

উল্লেখ্য, শবে বরাতের ইবাদত-বন্দেগী ব্যক্তিগত আমল। তাই আয়োজন করে মসজিদে বা অন্য কোথায় একত্রিত হবে না। তবে এমনিতেই যদি মসজিদে এককভাবে উপস্থিত হতে হতে কিছু মানুষ জড়ো হয়ে যায় তাহলে অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রত্যেকে যার যার আমল নিজস্বভাবে আদায় করবে। মাইকে দীর্ঘ সময় ওয়ায করা বা শবীনা পড়তে থাকা ভুল রেওয়ায।

রমাযান ও রোযা

রমাযান মুমিনের যিন্দেগীর আকাঙ্ক্ষিত মাস। কুরআন নাযিলের মাস। কল্যাণ ও পুণ্যে ভরা মাস। এ মাসে রহমতের সুবাতাস বইতে থাকে, মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। এ মাসে বহু পাপীকে নাজাত দেয়া হয়, নেক আমলের সাওয়াব বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন লাইলাতুল কদরের মত মহাউত্তম রজনী। এ রজনীর ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও অধিক ফযীলতময়। এ মাসে আল্লাহ পাক মুমিনদের উপর রোযা ফরয করেছেন। রোযা, একটি মহান ইবাদত, তাকওয়ার উন্নত সোপান। রোযার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের তাকওয়ার মহাদৌলত দান করেন। সর্বোপরি রোযার সমাপ্তিতে আল্লাহ পাক বান্দাদের ক্ষমা করে দেন।

হাদীস শরীফে রমাযানের ফযীলত সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে। তার কিছু নিম্নে পেশ করা হল–

রমাযানের প্রতীক্ষা

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতটা গুরুত্বের সাথে শা'বান মাসের দিন গুণতেন ততটা অন্য কোন মাসের ক্ষেত্রে করতেন না। এরপর রমাযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হতো তাহলে ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করতেন। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৩২৫)

রমাযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখা

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.

قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমাযান মাসের এক দু'দিন আগ থেকে রোযা রেখো না, তবে কারো পূর্বঅভ্যাসের সাথে সেদিনের রোযা মিলে গেলে ভিন্ন কথা। রমাযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখো আর (শাওয়ালের) চাঁদ থেকে রোযা ছাড়ো। যদি আকাশ আচ্ছন্ন হয়, তাহলে ত্রিশ পূর্ণ করো এরপর রোযা ছাড়ো। (সুনানে তিরমিযী, হা.নং ৬৮৪)

রমাযানের আগমনী বার্তা: জান্নাত উন্মুক্ত, জাহান্নাম আবদ্ধ, শয়তান অবরুদ্ধ

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

لما حضر رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خيرمن ألف شهر، من حرم خيرها فقدحرم. قال الشيخ شعيب الارنؤوط في تعليقه على المسند : هذا حديث صحيح، وإسناد رجاله رجال الشيخين.

একবার যখন রমাযান উপস্থিত হল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের নিকট রমাযান উপস্থিত হয়েছে। এটা বরকতময় মাস। আল্লাহ পাক এ মাসের রোযাকে তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানদের শিকলে বাঁধা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম; যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে প্রকৃতই বঞ্চিত হলো। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৭১৪৮)

রমাযানের ডাক : হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও! হে মন্দকামী! থেমে যাও!

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ : يا باغي الخير! أقبل، ويا باغي الشر! اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.

যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত উপনীত হয়, তখন শয়তান ও দুষ্টু জীনদের শিকলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় ফলে তার একটি দরজাও খোলা থাকে না। আর জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় ফলে তার একটি দরজাও বন্ধ থাকে না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা করে, হে কল্যাণের সন্ধানী! সামনে বাড়ো! আর হে মন্দের সন্ধানী! থেমে যাও! আর প্রতিরাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করা করা হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৬৪২)

জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর দু'আ কবুলের হীরণ্ময় ক্ষণ মাহে রমাযান

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وقال الهيثمي في المجمع : رواه البزار، ورجاله ثقات.

রমাযান মাসের প্রত্যেক দিন ও রাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। আর প্রত্যেক মুসলমানের একটি দু'আ, যা সে করে, কবুল করা হয়। (মুসনাদে বাযযার [কাশফুল আসতার]; হা.নং ৩১৪২, মাজমাউয যাওয়াইদ; হা.নং ১৭২১৫)

সিয়াম ও কিয়াম; তাকওয়ার অনুশীলন, মাগফেরাতের ঘোষণা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সূরা বাকারা-১৮৩)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

لِمَا فِيهِ مِنْ زَكَاةِ النَّفْسِ وَطَهَارَتِهَا وَتَنْقِيَتِهَا مِنَ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ.

রোযাতে আছে অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। এর মাধ্যমে অন্তরকে মন্দ উপাদান আর মন্দ স্বভাব থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৪৯৭)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وفي رواية مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সাওয়াবের আশা নিয়ে রমাযানের রোযা রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে রমাযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশা নিয়ে কিয়াম (তারাবীহ ও রাতের নফল নামায আদায়) করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৭, ৩৮, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৫৯, ৭৬০)

রোযার অতুলনীয় মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

আদমসন্তানের সকল আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু রোযা ছাড়া; কারণ রোযা আমার জন্য আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেবো। আমার জন্য রোযাদার তার কামনা ও খাদ্য পরিহার করে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি; ইফতারের সময় আর তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের বাসিগন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুবাসের চেয়েও উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৬৩৮)

এই বর্ণনারই অন্য সূত্রে আছে,

قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

বনী আদমের সকল আমল তার জন্য, শুধু রোযা ছাড়া। কারণ রোযা আমার জন্য এবং আমি নিজে তার প্রতিদান দেবো। রোযা হচ্ছে ঢাল (জাহান্নামের আযাবের মোকাবেলায়) স্বরূপ। যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখবে, সে যেন অশালীন কথা থেকে বেঁচে থাকে। চিৎকার-চেঁচামেচি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার ব্যক্তি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫১)

রোযার পবিত্রতা ও ব্যাপকতা

সওম মানে সংবরণ করা ও বিরত থাকা। বাহ্যিক অর্থে সওমের অর্থ খানা-পিনা ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা হলেও রোযার মর্মের মধ্যে সকল গুনাহ, অন্যায় ও অশালীন কর্ম থেকে বিরত থাকাও নিহিত আছে।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা পরিহার না করে, আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই যে, সে তার খানা-পিনা পরিহার করবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০৩)

দানশীলতার শ্রেষ্ঠ সময়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। কিন্ত রমাযানে তিনি অন্যান্য সময়ের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন, যখন জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে মিলিত হতেন। তিনি রমাযানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে একত্রিত হয়ে কুরআন দাওর করতেন। নিশ্চয় তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবহমান বায়ু থেকে অধিক কল্যাণ-বিতরণকারী হতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬)

সাওয়াবের অবারিত ধারা রোযাদারকে ইফতার করানো

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ আলজুহানী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

قال الترمذى : هذاحديث حسن صحيح.

যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সে তার সমান প্রতিদান পায়; কিন্তু রোযাদারের প্রতিদান থেকে মোটেই কমানো হয় না। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৮০৭)

রমাযানের শেষ দশক
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়

পুরো রমাযানের মধ্যে শেষ দশক অন্য রকম মর্যাদা ও গুরুত্ব রাখে। হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ রজনী এ সময়েই পাওয়া যেতে পারে। তাই রমাযানের অন্যান্য অংশের চেয়ে অধিক প্রেরণা নিয়ে এ সময় ইবাদতে লেগে যাওয়া কর্তব্য। দিন ও রাতের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠা উচিৎ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়ে কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন।

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا.

قَالَ التِرمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে এতটা পরিশ্রম করতেন যা অন্য সময় করতেন না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৭৫, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৯৬)

হযরত আয়েশা রাযি. থেকেই অপর বর্ণনায় আছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

যখন রমাযানের শেষ দশক শুরু হতো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি জাগরণ করতেন এবং ঘরের লোকদের জাগিয়ে দিতেন। ইবাদতে পরিশ্রমী হতেন এবং কোমর বেঁধে নিতেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৭৪, সহীহ বুখারী; হা.নং ২০২৪)

মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল কদর

এই রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ পাক এই রাতের ফযীলত বর্ণনা করে কুরআন মাজীদে সূরাতুল কদর নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

(অর্থ) নিশ্চয় আমি তা (কুরআনে মাজীদ) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি। আপনি কি জানেন, লাইলাতুল কদর কী! লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিবরাঈল আ.) প্রত্যেক কাজে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়। শান্তিই শান্তি! ফজরের উদয় পর্যন্ত।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি লাইলাতুল কদর চিনতে পারি, তাহলে আমি কী পড়বো? তিনি বলেন, তুমি বলো,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল করুণাময়! আমায় ক্ষমা করো! (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫৩৮৪, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৫১৩)

হাদীস শরীফে লাইলাতুল কদরের বহু ফযীলত এসেছে। এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ঈমান ও সাওয়াবের আশা নিয়ে ইবাদতে মশগুল হবে, আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০১)

লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি?

এক হাদীসে আছে, 'লাইলাতুল কদর রমাযানের শেষ দশকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে দেখানো হয়েছে, তা বেজোড় রাত্রি। সে রাত শেষে প্রভাতে আমি সিজদা করছি ভেজা মাটি আর পানির মাঝে।' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৬৭)

বিভিন্ন রকম বর্ণনার আলোকে উলামায়ে কেরামের মধ্যে লাইলাতুল কদর নির্ধারণে মতভেদ হয়েছে। কেউ একুশতম, কেউ তেইশতম, কেউ পঁচিশতম, অনেকের মতে সাতাশতম আর কারো মতে উনত্রিশতম রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর। প্রত্যেকটি মতের পেছনে হাদীসের বিভিন্ন ইশারা রয়েছে। (দ্র. তাফসীরে কুরতুবী ২০/১৩৭) মোটকথা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে বিশেষভাবে লাইলাতুল কদর তালাশ করবে। প্রতি বেজোড় রাতে ইবাদত-বন্দেগী, তিলাওয়াত ও যিকর-আযকারের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কারণ হাদীসে এসেছে, যে এই রাতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে প্রকৃতই বঞ্চিত!

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বর্ণনা করেন,

دخل رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولايحرم خيرها إلا محروم.

قال المنذري : إسناده حسن، إنشاءالله، وكذا قاله البوصيري.

একবার রমাযানের আগমন হল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট এই মাস উপস্থিত হয়েছে। এই মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, যে এই রাত থেকে বঞ্চিত হল সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। আর এই রাতের কল্যাণ থেকে সেই বঞ্চিত হয় যে প্রকৃতই কল্যাণবঞ্চিত। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৬৪৪)

ই'তেকাফ : আত্মনিমগ্নতার অনুপম সুযোগ

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত রমাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তেকাফ করতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০২৬, সহীহ মুসলিম, হা.নং ১১৭২)

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, রমাযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের সন্ধানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তেকাফ করতেন। এর মাধ্যমে তিনি অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হতেন, অন্তরকে নিবিষ্ট করতেন এবং আল্লাহর সাথে আলাপন, যিকির ও দু'আয় একান্ত হতেন। (লাতাইফুল মা'আরিফ ১/১৯০)

এটাই ই'তেকাফের মর্ম। সারা বছর জনসমাগম আর কোলাহলেই কেটে যায় আমাদের সময়গুলো। আল্লাহর সাথে একান্ত হওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। তাই রমাযানের শেষ দশক এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও মোক্ষম সময়। ই'তেকাফকারী সুনিশ্চিতভাবেই শবে কদর লাভ করতে পারে। কারণ মসজিদে অবস্থানের প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত। তাই কদরের রাত্রিও এর মাধ্যমে ইবাদতে কাটানোর উত্তম সুযোগ হয়ে যায়।

ই'তেকাফের হাকীকত

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, ই'তেকাফের হাকীকত হলো, সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে স্রষ্টার জন্য নিবেদিত হওয়া। একজন বান্দার ভেতর আল্লাহর মা'রেফত, ভালবাসা ও আপনত্ব যতটা বৃদ্ধি পাবে, ততটা তা তাকে আল্লাহর প্রতি একান্ত করে তুলবে। জনৈক বুযুর্গ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের মধ্যে আল্লাহর সাথে একান্ত হতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার নিঃসঙ্গতা অনুভব হয় না? তিনি বললেন, কেন হবে? আল্লাহ পাকের ঘোষণা শোনেননি? তিনি বলেছেন– 'যে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি।'

কবি বলেন,

أوحشتني خلواتي ... بك من كل أنيسي

وتفردت فعاينتك ... بالغيب جليسي

তোমার সাথে আমার নির্জনতা সকল বন্ধুকে অচেনা করে দিয়েছে। আমি একা হয়েছি, তখন অদৃশ্যপটে তোমাকে আমার সঙ্গীরূপে দেখতে পেয়েছি।

সুতরাং ই'তেকাফের এই মর্মকে মনে গেঁথে সে সময়গুলো কাটানো কর্তব্য। অনর্থক কথা, অনর্থক কাজ, অযাচিত যে কোন আচরণ থেকে বিরত থাকার অনুশীলনের এত উত্তম পন্থা আর হয় না। আল্লাহ পাক আমাদের আমলের তাওফীক দান করুন।

(এই রচনা তৈরিতে বিশেষ সহযোগিতা নেয়া হয়েছে– মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব রচিত 'বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শাবান ও শবে বরাত' এবং 'কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রমাযানুল মুবারক', মুফতী সালমান মনসূরপুরী রচিত 'তোহফায়ে রমাযান', ওয়াযারাতুল আওকাফ কাতার কর্তৃক প্রকাশিত 'আল ইলমাম বিমা য়াতাআল্লাকু বিশাহরি রামাযান মিনাল আহকাম' বইগুলো থেকে। জাযাহুমুল্লাহু খাইরা মা ইয়াজ্যী বিহী ইবাদাহুস সালিহীন)

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

রমাযান : পূর্বসূরীগণ যেভাবে কাটাতেন

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

রমাযান বছরের পবিত্র একটি মাস। এ মাসকে অনেক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দ্বারা বিশিষ্ট করা হয়েছে। এ মাস তওবা ও ক্ষমার মাস। পাপ-পঙ্কিলতার মার্জনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। পবিত্র কুরআন এ মাসে নাযিল হয়েছে। বরং প্রসিদ্ধ আসমানী গ্রন্থগুলো অবতীর্ণের মাসও রমাযান। হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহ রমাযানের প্রথম রাতে নাযিল হয়েছে। তাওরাত নাযিল হয়েছে ছয় রমাযান অতিক্রান্ত হওয়ার পর। ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে রমাযানের তেরো দিন অতিক্রম হওয়ার পর। আর কুরআন নাযিল হয়েছে চব্বিশ রমাযান অতিক্রম হওয়ার পর। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৬৯৮৪)

أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان... الخ قال الشيخ الارنووط: حديث ضعيف.

এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ কারণে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সারা বছর এ মাসের প্রতীক্ষায় থাকতেন, রমাযান প্রাপ্তির জন্য দু'আ করতেন এবং লাভ হলে এর যথাযথ মূল্যায়ন করতেন।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ লাতায়িফুল মা'আরিফ (১/১৪৮)-এ উল্লেখ করেন। মু'আল্লা ইবনুল ফযল বলেন, পূর্ববর্তীরা ছয় মাস পর্যন্ত দু'আ করতেন রমাযান লাভের জন্য। এরপর যখন রমাযান লাভ হতো পরবর্তী পাঁচ মাস রমাযানে কৃত আমল কবুলের জন্য দু'আ করতে থাকতেন। হিলয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে (৩/৬৯) বর্ণিত আছে, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর (মৃত্যু : ১২৯/১৩২হি.) দু'আ করতেন,

اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে রমাযান মাসে পৌঁছে দিন, রমাযান মাস আমার জন্য নিরাপদ রাখুন এবং রমাযানে আমার কৃত আমল কবুল করে নিন।

ইমাম তবারানী 'আদ-দু'আ' গ্রন্থে (হা.নং ৯১৩) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মাকহুল (মৃত্যু : ১১২হি.) থেকেও উক্ত দু'আ বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে উবাদা ইবনে সামিত রাযি.-এর সূত্রে দু'আটি মারফূ'-ভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

বুযুর্গগণ যখন রমাযান লাভ করতেন তো রমাযান কাটাতেন গুনাহমুক্তভাবে। তাদের মধ্যে আমল করার চেয়ে কৃত আমল নষ্ট হওয়ার ভয় বেশি ছিলো। মালেক ইবনে দীনার (মৃত্যু : ১২৭হি.) বলেন,

الخوف على العمل ان لا يتقبل اشد من العلم.

অর্থ : আমলের চেয়ে আমল কবুল না হওয়ার ভয় দৃঢ়তর ও গুরুতর। (হিলয়াহ ২/৩৭৭)

আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (মৃত্যু : ১৫৯হি.) বলেন, আমি আমার পূর্বসূরীদের পেয়েছি যে, তারা নেক আমল করার জন্য খুব চেষ্টা-সাধনা করতেন। যখন তারা ভালো আমল করতে সক্ষম হতেন চিন্তা ও পেরেশানীতে ডুবে যেতেন যে, তাদের আমল কবুল হলো কি হলো না! (লাতাইফুল মা'আরিফ ১/২০৯)

রোযা মুমিনের জন্য ঢাল স্বরূপ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা হলো ঢাল স্বরূপ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৪৯২)

সুনানে বাইহাকীতে (হা.নং ৮৩১৪) আছে, রোযা ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিদীর্ণ না হয়। একটি বর্ণনায় এসেছে, মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয়, কবরে রাখার পর নামায তার মাথার কাছে হবে, যাকাত থাকবে তার ডানে, রোযা থাকবে তার বামে...।

ঢাল যেমন বাম হাতে থাকে, রোযা তেমনি বাম পাশে থেকে হেফাযত করবে। এ ঢাল বান্দার তখনই কাজে আসবে যদি তা অক্ষত রাখা হয়। আযাব থেকে বাঁচার এই ঢাল অক্ষত রাখার জন্য সবচেয়ে আবশ্যক হলো, গুনাহমুক্ত রমাযান কাটানো।

হযরত থানবী রহ. বলেন,

اگر ہمیشہ ہم کو اس پر قادر نہیں کہ معاصی کو گھٹا دیں تو رمضان میں تو ایسا کر لیا جائے۔

অর্থ : পাপাচার যদি আমরা সবসময় হ্রাস করতে সক্ষম না-ও হই, অন্তত রমাযানে তো করতে পারি। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত... যে রমাযানে কোন নেক কাজ কৃত্রিমতা ও কষ্ট-ক্লেশের সাথে করে, পরবর্তীতে সে তা করার সক্ষমতা সহজেই লাভ করে এবং যে ব্যক্তি রমাযানে কোন গুনাহ পরিহার করে, পুরো বছর সহজেই তা পরিহার করতে সক্ষম হয়। এ মাসে গুনাহ ত্যাগ করা কঠিন নয়। কারণ শয়তান বন্দি থাকে। গুনাহের প্রতি প্ররোচনাকারী যখন বন্দি, তো গুনাহ এমনি কমে যায়। হ্যাঁ, গুনাহ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হবে তা আমি বলছি না। কারণ গুনাহের অপর উদ্দীপক কুপ্রবৃত্তি তো বিদ্যমান। তবে হ্যাঁ, এর প্রভাব কমে যাবে। যদি একটি মাস গুনাহ ছাড়ার জন্য কষ্ট সহ্য করে নিতে পারে তাহলে এতে কী এমন ক্ষতি! (খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ১০/৩১৫)

রোযার প্রকৃত ফল লাভের জন্য প্রয়োজন বিশেষ কিছু গুনাহ ত্যাগ করা

আল্লামা আলী নদবী রহ. বলেন, রোযা উদ্দেশ্যহীন, অনর্থক কিংবা কোন বেগার খাটুনি নয়। বরং এ হচ্ছে মুজাহাদার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক শুচিতা অর্জনের এক কার্যকর শোধনাগার বা প্রশিক্ষণ সেন্টার। সিয়াম সাধনা মানুষকে এতই শুচিশুভ্র ও পূতঃপবিত্র করে দেয় যে, সে তখন পাশববৃত্তি ও ষড়রিপুর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হয়। জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা তার উপর প্রভুত্ব করে না; বরং সে-ই তাকে শাসন করে। (আরকানে আরবা'আ; পৃষ্ঠা ২৩৫)

হ্যাঁ, ডাক্তারের লেখা ওষুধ সেবনের মাধ্যমে রোগী উপকৃত হতে হলে যেমন কিছু জিনিস পরিহার করা আবশ্যক, তদ্রূ রোযার প্রকৃত ফল লাভ করতে হলে পানাহার ও জৈবিক চাহিদার সাথে সাথে কিছু গুনাহ ত্যাগ করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

অর্থ : যে ব্যক্তি মিথ্যা, হক পরিপন্থী কথা ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার না করে, তার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ছেড়ে দেয়া আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮০৪)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় বর্ণিত আছে, হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, যে গীবত ও মিথ্যা থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারবে তার রোযা নিরাপদ ও অক্ষত হবে।

রোযা অবস্থায় জৈবিক চাহিদা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করা, ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হওয়া নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فإن امرؤ شاتمه أوقاتله فليقل إني صائم إني صائم.

অর্থ : যদি কেউ গালি দেয় কিংবা লড়াইয়ে লিপ্ত হতে চায় তবুও আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে প্রতিউত্তর করে– আমি রোযাদার (রোযার সম্মানে আমি তোমার মন্দ আচরণের কোন জবাব দিবো না)। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৫৯)

রোযা হতে হবে প্রতিটি অঙ্গের মাধ্যমে। চোখ, কান, জিহ্বা, সকল অঙ্গ গুনাহমুক্ত রেখে রোযা পালন করতে হবে। রমাযানে নিজের চাকর-নওকরের কাজ হালকা করে দিতে হবে। রোযার দিনগুলো রোযাবিহীন দিন থেকে যে ভিন্ন, সেদিকে পূর্ণ লক্ষ রাখতে হবে। ইবাদত, আমল, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবদিক থেকে পার্থক্য স্পষ্ট হতে হবে। হযরত জাবের রাযি. বলেন,

إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء.

অর্থ : যখন রোযা রাখবে, তোমার কর্ণ, চক্ষু ও জিহ্বারও রোযা রাখবে। অর্থাৎ মিথ্যা ও পাপমুক্ত রাখবে। চাকর-নওকরের কষ্ট দূর করে দিবে। স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে রোযা পালন করবে। রোযার দিন ও রোযাবিহীন দিনকে বরাবর বানাবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৪৮৮০)

ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন,

كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم.

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলতেন, মিথ্যা রোযা ভেঙে দেয়।

হযরত থানবী রহ. বলেন, ایک زبان ہی کے بیس گناہ ہے جیساکہ امام غزالی نے لکھا۔ (শুধু যবানেরই বিশটি গুনাহ রয়েছে। যেমনটি ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন। (খুতুবাতে হাকীমুল উম্মত ১০/৩১৬)

সালাফে সালেহীন যবানের গুনাহ থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতেন। মানুষ যবানের যে গুনাহকে গুনাহ মনে করে না অর্থাৎ পরনিন্দা, পূর্বসূরীগণ তা থেকে এমনভাবে বেঁচে থাকতেন যে, নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার সামর্থ্য রাখতেন। আবূ বকর ইবনে মুনাইয়ির বলেন, ইমাম বুখারী রহ. কে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী যে, কারো গীবত করেছি বলে তিনি আমার হিসাব নিবেন না। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১০৩)

রোযা অবস্থায় অনর্থক বাইরে ঘুরাফেরা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

প্রকৃত রোযাদার পবিত্র রমাযানে নিজের জীবনযাত্রাকে অনেক সীমিত করে নেয়। বরং রমাযানের পূর্ব থেকে এমনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যাতে পুরো রমাযান আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্কের জন্য ব্যয় হয়। এজন্য রমাযানে মার্কেটিং, বাজার, ঈদের কেনাকাটা সবকিছু থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিৎ। আল্লাহর ঘর মসজিদ কিংবা নিজ ঘরের অভ্যন্তর রমাযান কাটানোর মূল ক্ষেত্র হওয়া উচিৎ। ইবাদতের মধ্যে সময়গুলো কাটানো উচিৎ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন রমাযানের প্রথম রজনীর সূচনা হয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে– হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অনিষ্টের অন্বেষী! বিরত হও। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৬৮২)

يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر.

আবুল মুতাওয়াক্কিল (মৃত্যু : ১০২হি.) বর্ণনা করেন, আবূ হুরাইরা রাযি. ও তার সঙ্গীগণ যখন রোযা রাখতেন মসজিদে অবস্থান করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

أن أبا هريرة وأصحابه كانوا اذا صاموا جلسوا في المسجد.

বিশিষ্ট তাবেয়ী তলীক্ব ইবনে কায়েস রহ. যখন রোযা রাখতেন নামাযের সময় ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না।

ফাযায়েলে আমালের সংকলক শাইখ যাকারিয়া রহ. আপবীতী গ্রন্থে (২/৬৮) তার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন– হাকেম তৈয়্যেব রামপুরী আমার একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এক রমাযানে সকাল নয়টা দশটার দিকে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন। খাদেমকে বললেন, দরজা খোলো, আমি শাইখের সাথে সাক্ষাত করবো। খাদেম রাজি হলো না এবং তাকে বললো, এখন রমাযান। তিনি বিরক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী মাদরাসার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে মাওলানা মনযূর আহমাদ খান সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি হাকেম তৈয়্যবকে বললেন, کہاں آگئے یہاں تو رمضان ہے۔ (কোথায় এসেছেন? শাইখের এখানে তো রমাযান)। তো হাকেম সাহেব মাদরাসায় চলে গেলেন। সেখানে নাযেম সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো। নাযেম সাহেব চিঠি লেখাচ্ছিলেন। তিনিও হাকেম সাহেবকে বললেন, کہاں آ گئے یہاں تو رمضان ہے۔ (কোথায় এসেছেন? শাইখের এখানে তো রমাযান)। এক পর্যায়ে সারাদিনেও যখন তিনি শাইখের তিলাওয়াত ও নামাযের কারণে তার সাথে দেখা করতে পারলেন না, তখন বলতে লাগলেন, রমাযান তো বহু স্থানে আসে; কিন্তু এখানকার মতো এভাবে আসে না!!

হযরত আবূ যর গিফারী রাযি. বলেন,

اذا صمت فتحفظ ما استطعت.

অর্থ : যখন তুমি রোযা রাখবে, সাধ্যানুযায়ী আত্মসংবরণ করো। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৮৮৭৮)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আসাদ বলেন, যখন রমাযানের শেষের দশক শুরু হতো ইবনে মাঈনের সাথে খুব সামান্যই কথা বলার সুযোগ মিলতো। (আল-জাওয়াহিরু মুযিয়্যাহ ২/৪৯৩)

فاذا دخل العشر الاخير ما نقدر ان نتكلم معه إلا قليلا.

রমাযানের বিশেষ কিছু আমল

রমাযানের বিশেষ একটি আমল হলো, কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআনের হালকা বসানো। পবিত্র রমাযানের সাথে কুরআনুল কারীমের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কুরআন নাযিলের মাস এটি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে অন্য সময়ের চেয়ে কুরআনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করতেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন,

وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران.

অর্থ : জিবরাঈল আ. প্রতি রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হতেন এবং কুরআন শোনাশুনি করতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬)

একটি হাদীসে রোযা ও কুরআনকে সুপারিশকারী হিসেবে উল্লেখ করা

হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে বাধা দিয়েছি, অতএব তার পক্ষে আমাকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি রাতে তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি; সুপারিশকারী হিসেবে আমাকে গ্রহণ করুন। তখন উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসনাদে আহামদ; হা.নং ৬৬২৬)

পূর্বসূরী নেককারগণ রমাযানকে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করতেন। এমনকি হাদীসের দরস ও অন্যান্য শিক্ষা মজলিসও স্থগিত রাখতেন। ইবনে আব্দুল হাকাম রহ. ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বলেন,

كان مالك اذا دخل رمضان يفر من قراء الحديث ومجالسة اهل العلم وأقبل على تلاوة القران من المصحف.

অর্থ : ইমাম মালেক রহ. যখন রমাযানে পৌঁছতেন হাদীস পাঠ ও আহলে ইলমের মজলিস ত্যাগ করতেন এবং কুরআন দেখে পাঠ করায় মনোনিবেশ করতেন।

সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত, রমাযান এলে তিনি অন্যান্য নফল ইবাদত ছেড়ে দিতেন; কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন। ইমাম যুহরী রহ. বলতেন, রমাযান তো হলো কুরআন ও খানা খাওয়ানোর জন্য। (লাতাইফুল মা'আরিফ ১/১৭১)

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.-এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

اذا دخل رمضان يتفرغ لقراءة القران.

অর্থ : রমাযান এলে তিনি কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেতেন এবং রমাযানে তিনি ষাট খতম কুরআন পড়তেন। (আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ২/৪৯৩)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ব্যাপারে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বর্ণনা করেন যে, তারা প্রত্যেকে রমাযানে ষাট খতম কুরআন পড়তেন। কাতাদাহ রহ. রমাযানে কুরআনের দরস দিতেন। (লাতাইফুল মা'আরিফ ১/১৭১)

ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে,

كان محمد بن اسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، يقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال يختمه.

অর্থ : তিনি রমাযান মাসে দিনের বেলা প্রতিদিন একবার খতম করতেন এবং তারাবীহর পর প্রত্যেক তিন রাতে এক খতম কুরআন পড়তেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১০৩)

নোট : এখান থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ইমাম বুখারী রহ. তারাবীহকে আলাদা নামায গণ্য করতেন। এরপর ভিন্নভাবে কিয়ামুল-লাইল পড়তেন।

শাইখ যাকারিয়া রহ. নিজের রমাযানের আমল সম্পর্কে বলেন,

۲۴ گھنٹے میں اس کی تشکیل ضروری تھی کہ ۳۰ پارے پورے ہو جائیں اللہ کے انعام و فضل سے سالہا سال یہی معمول رہا۔

অর্থ : আমার চব্বিশ ঘণ্টার রুটিন এমনভাবে তৈরি ছিলো যে, ত্রিশ পারা তিলাওয়াত পুরা হয়ে যায় (অর্থাৎ এক পারা ত্রিশ বার তিলাওয়াত হয়ে যায়)। আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে বছরের পর বছর এটাই ছিলো আমার রমাযানের কর্মপদ্ধতি। (আপবীতী ২/৬৮)

সালাফে সালিহীনের রমাযান এভাবে কাটতো। এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত তাদের জীবনীগ্রন্থ-গুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। খুব সামান্য অংশ আমরা এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

আমাদের উচিৎ, পূর্বসূরীর রমাযান ও আমাদের রমাযানের পার্থক্যগুলো বের করা এবং নিজেদের রমাযানকে যথাসাধ্য তাদের রমাযানের মত করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা ভরপুর তাওফীক নসীব করুন।

লেখক : পেশ ইমাম, পার্ক সংলগ্ন জামে মসজিদ, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।

(১৮ পৃষ্ঠার পর; সফরনামা)

হেলাল ভাইয়ের বড় ভাই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। বায়ান্ন শতাংশ জায়গাজুড়ে হেলাল ভাইয়ের নতুন বাড়ি; শখের বসতঘর। সেখানেই মাগরিবের নামায আদায় করে গ্রামের জামে মসজিদে গিয়ে ৮.৪৫ মিনিট পর্যন্ত বয়ান করা হল। বাইরে পর্দায় ঘেরা মহিলাদের প্যান্ডেল। পুরুষ শ্রোতারা মসজিদ পরিপূর্ণ ছিলো।

বয়ান শেষে ইশার নামায। নামায শেষে বড় ভাইয়ের ঘরে রাতের মেহমানদারী গ্রহণ এবং রাত ১০.১৫ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা। প্রায় সাড়ে এগারোটায় আমরা মোমেনশাহী শহরে প্রবেশ করি এবং পূর্ব এরাদা অনুযায়ী মোমেনশাহী জামি'আ ইসলামিয়ার সামনে এসে পৌঁছাই। গাড়ি থেকে নেমে জামি'আর প্রধান ফটক হয়ে ভিতরে গিয়ে একজন উস্তাদ ও কয়েকজন স্টাফের সাক্ষাৎ পাই। তাদের কাছে হযরত মাওলান আতহার আলী রহ. এর মাযার কোথায় জানতে চাইলে হাতের বাম পাশেই দেখিয়ে বললো, এখানে দু'টি কবর আছে। দ্বিতীয়টি হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ.-এর। যিয়ারত করলাম। অশ্রু সংবরণ করতে ব্যর্থ হলাম। দীর্ঘ দিনের আশা পূরণ হলো।

হযরত আতহার আলী রহ. ছিলেন ক্ষণজন্মা ঐ সকল মহাপুরুষদের অন্যতম যারা উপমহাদেশকে ব্রিটিশদের গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে এ জাতিকে দিল্লির গোলামী থেকে স্বাধীন করে ১৯৭১ সালের চূড়ান্ত স্বাধীনতার ভিত রচনা করে দিয়েছিলেন। ৪৭ সানে দিল্লির গোলামী থেকে স্বাধীন না হলে পরবর্তী স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের কোনদিন পূরণ হতো না। কাশ্মীরে যেমন রক্তবন্যা বয়েই চলছে কিন্তু স্বাধীনতা আজো অধরা, আমাদের পরিণতিও তেমনই হতো। কাজেই বাঙ্গালী জাতি হযরত আতহার আলী রহ.-এর মতো ত্যাগী আলেমদের কাছে চির ঋণী। বস্তুত আমাদের স্বাধীনতা দুই পর্বে অর্জিত হয়েছে। প্রথম পর্বের সিংহভাগ অবদান আমাদের পূর্বসূরী আলেম সমাজের। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ও আলেম বিদ্বেষী কিংবা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ একটি মহল আমাদের স্বাধীনতার প্রথম পর্বটি জনগণ ও নতুন প্রজন্ম থেকে সবসময় আড়াল করে রাখে। এরা মূলত দিল্লির কিংবা ভিনদেশের দালাল। এরা আমাদের স্বাধীনতাকে নামসর্বস্ব ও অর্থহীন করে আমাদেরকে কার্যত দিল্লির গোলামীতে আবদ্ধ করতে কিংবা কোন ভিনজাতির দ্বারা আমাদের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে দিতে তৎপর। জাতি এদেরকে চিনতে ভুল করলে এমন সর্বনাশ হবে, যার খেসারত কিয়ামতের আগ পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে।

হযরতের মাযার যিয়ারত শেষে আবার যাত্রা শুরু হলো। রাত দু'টোর পর আল্লাহর মেহেরবানীতে বাসায় পৌঁছলাম এবং সফর শেষের দু'আ ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. পড়ে বাসায় প্রবেশ করলাম।

লেখক : নায়েবে মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(৯ পৃষ্ঠার পর; ইসলাম যিন্দা হয়...)

যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো তখন তিনি তাঁর অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে দিবেন না এবং বলে দিবেন না যে, যাও, তোমার কোনো প্রয়োজন নেই! এর কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও আয়াত নাযিল হয়েছিলো। يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার শরীয়ত ও দীন ইসলাম থেকে বিমুখ হও, তাহলে আমি তোমাদের বিলুপ্ত করে তোমাদের স্থলে এমন লোকদের আনবো, যাদেরকে আমিও পছন্দ করি এবং তারাও আমাকে পছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরাম থেকেও অমুখাপেক্ষিতা ঘোষণা করেছিলেন।

গাফলতের শাস্তি দুশমনের আঘাত

যে সমস্ত মুসলমানদেরকে বনু আব্বাসিয়াকে বিজয়ী করার মাধ্যমে রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো, ইসলামের ঝাণ্ডা দেয়া হয়েছিলো, যখন তাদের মধ্যে অন্যায় রক্তপাত ও খুনোখুনির সূচনা হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হালাকু খানকে লেলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিলেন যে, ইসলাম টিকে আছে তোমাদের শক্তিতে নয়, এই কুরআনের হেফাযত তোমাদের কারণে হচ্ছে না, বরং إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 'আমিই এই কুরআনের হেফাযত করছি।' এতদিন তোমাদের মাধ্যমে হেফাযত করেছি, এখন অন্যদের মাধ্যমে করবো। আল্লাহ তা'আলার সত্তা অমুখাপেক্ষী।

শুধু বাগদাদ শহর ও এর আশেপাশে হালাকু খানের আক্রমণে আঠারো লক্ষাধিক মুসলমানকে কচুকাটা করে হত্যা করা হয়েছিলো। দজলার পানি তাদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিলো। এত পরিমাণ কিতাব তারা পুড়িয়ে দজলায় ফেলেছিলো যে, দজলার প্রবহমান পানি থেমে গিয়েছিলো। মুসলমানদের এমন নির্মম শাস্তি আল্লাহ তা'আলা এজন্যই দিয়েছিলেন যে, মুসলমানেরা ইসলামের আহকাম পালন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামকে তারা নিজেদের জন্য কেবলমাত্র খোলস বানিয়ে নিয়ে তার আড়ালে ভোগবিলাসে মত্ত ছিলো। পরস্পরে ঝগড়াবিবাদ আর মারামারি-হানাহানিতে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ তা'আলা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সমূলে উৎখাত করে দিলেন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

এরপর কি ইসলামও শেষ হয়ে গিয়েছিলো? না; বরং যারা সেদিন আঠারো লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছিলো এবং বাগদাদের মূল্যবান কুতুবখানা পুড়িয়ে পানিতে ফেলে দিয়েছিলো, তাদের বংশধরেরাই পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলো এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নূর পূর্ণতা পেয়েছিলো।

দীর্ঘ ৭০০/৮০০/৯০০ (মতান্তরে) বছর পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী এদেরই বংশধর তুর্কী-মোগলদের শাসনাধীন ছিলো। আরব, ফিলিস্তিন, হিন্দুস্তান তথা সব জায়গায় তাদের রাজত্ব ছিলো। এরা ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং এদের অধীনে মাদরাসাসমূহ চালু ছিলো। বাদশাহ, খানসামা, আমীর, নবাব– এরাই ছিলো মাদরাসাসমূহের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক।

এরপর যখন মোগলদের রাজত্ব খোকলা ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেলো, তাদের আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হলো এবং দুনিয়াবাসীরও ধারণা হলো যে, ইসলাম মোগলদের কারণে টিকে আছে এবং ইসলামের অস্তিত্ব মোগলদের উপর নির্ভরশীল, তখন ইংরেজরা একযোগে বিপুল বিক্রমে সমস্ত মুসলিম রাজ্যে আক্রমণ চালালো। কোথাও ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে, কোথাও হামলা করে সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে তারা তছনছ করে দিয়েছিলো। বাগদাদে উসমানী খেলাফতের যে নিভুনিভু প্রদীপ জ্বলছিলো তা-ও নিভিয়ে দিয়েছিলো। খেলাফতকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো। এমনকি তৎকালীন খলীফা স্বয়ং খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

দুশমনের হামদর্দী!

ইংরেজরা মনে করেছিলো, এখন ইসলামও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আরে! যখন খেলাফতে রাশেদার অবসানের পরও ইসলামের হেফাযত হয়েছে, বনু উমাইয়ার পতনের পরও হেফাযত হয়েছে, বনু আব্বাসিয়ার পতনের পরও হেফাযত হয়েছে, তখন মোগলের পতনের পর, খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পরও যথারীতি ইসলামের হেফাযত হবে। কিন্তু ইংরেজরা এটাই বুঝেছিলো। তারা দিল্লীর লালকেল্লায় ঘোষণা দিলো, এখন ভারতবর্ষে এমন জাতি তৈরি হবে, যারা দৈহিক রং ও বংশপরম্পরায় ভারতীয় হবে; কিন্তু মনমানসিকতা ও চিন্তাচেতনার দিক দিয়ে খ্রিস্টান হবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে দশ হাজার খ্রিস্টান মিশনারী নামানো হলো, পাদ্রীদেরকে নামানো হলো। আপনাদের বাংলাদেশের ঢাকা, পাকিস্তানের করাচী, ভারতের দিল্লীতেও এদের প্রচুর সংখ্যক নামানো হয়েছিলো। তারা সবখানে ছড়িয়ে পড়লো। এটা তাদের জন্য বিরাট সুযোগ ছিলো। আহা! এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কত নিপীড়িত মজলুম, এরা এক একটা রুটির জন্য বুভুক্ষু জাতি; এদের সামনে খ্রিস্টধর্ম পেশ করে এদের ধর্মান্তর করা সহজ হবে।

ভাইয়েরা! আমাদের মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, এটা সে সময়কার কথা, যখন দিল্লীসহ সব বড় বড় শহরে উলামায়ে কেরামকে শূলিতে চড়ানো হয়েছিলো, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে এমন কোনো গাছ ছিলো না, যে গাছে কোনো আলেম বা কোনো বুযুর্গের লাশ ঝোলানো হয়নি। বুযুর্গানে দীন ও উলামায়ে কেরামকে এবং আমীর-উমারা ও নবাবদের এভাবে ব্যাপকহারে শহীদ করে দেয়ার পর, তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার পর তাদের সন্তানেরা ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়েছিলো, যাতে তারা নিজেদের ও তাদের মায়েদের পেট চালাতে পারে এবং বোনদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাযত করতে পারে। গতকাল যাদের পিতারা হাজারো হাতির দল নিয়ে সফর করতো, হাজারো মাশায়েখ যাদের পিতাদের পিছনে চলতো, আজ তারা দিন ও রাতের রুজির সন্ধানে বাধ্য হয়ে গেছে। আজ সেই ছেলেই ভিক্ষার পাত্র নিয়ে অলিগলিতে ঘুরে ফিরছে। এই সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারীগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো। খ্রিস্টান পাদ্রীরা এসে বাচ্চাদের হাত ধরে বললো, তোমাদের আম্মার কাছে আমাদের নিয়ে চলো। তাদের পর্দানশীন মায়েরা, যারা সাত পর্দার ভেতরে অবস্থান করতো, তাদের কাছে গিয়ে এই পাদ্রীরা বাইরে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলো যে, এই বাচ্চাটাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও। আমরা একে পড়ালেখা করিয়ে কালেক্টর বানাবো, ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, ডাক্তার বানাবো। তার পড়ালেখার সময়ে আমরা তার খরচ চালাবো এবং তোমাদের খরচও চালিয়ে নিবো।

আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তাদের এসব উদ্যোগ কি এই বাচ্চাদের প্রতি সহমর্মিতা ছিলো? এটা যদি সহমর্মিতাই হয়, তাহলে এদের পিতাদের বুকে ছুরি চালিয়ে কেন তাদের এতীম করা হয়েছিলো? এই মাসুম বাচ্চাগুলোর পিতাদেরকে কামানের মুখে বসিয়ে কেন

এভাবে কামান দাগানো হতো যে, তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্ত এবং গোশত ধুলোবালির মতো বাতাসে উড়ে যেতো? ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই ছিলো তাদের একমাত্র এজেন্ডা। মুসলমানদের বলবান পুরুষদেরকে ছলেবলে, নানা ছুতোয় শেষ করে দাও, তারপর তাদের এতীম বাচ্চাদেরকে গির্জা, মিশনারীতে আর ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে তাদের মধ্যে খ্রিস্টবাদের প্রচার করো। তাহলে তাদের মাধ্যমে খ্রিস্টবাদ তাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ খ্রিস্টান হয়ে যাবে।

এ সময় সমগ্র বিশ্ব খ্রিস্টানদের শাসনাধীন ছিলো। বলা হয়, ইংরেজদের শাসনাধীন এলাকায় সূর্যাস্ত হতো না। তাদের রাজত্ব সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছিলো। তারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে খ্রিস্টবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু এই ভারতবর্ষেই নয়, বরং সব জায়গায় এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলো।

দিলের দরদ, উম্মতের আলো

এমতাবস্থায় আল্লাহওয়ালাদের মনে অস্থিরতা শুরু হলো। বুযুর্গানে দীনের অন্তর বেকারার হলো। এখন ইসলামের কী হবে? এখন উম্মতের কী হবে? তাদের দিলের মধ্যে অস্থিরতা আর পেরেশানির সেই ব্যথা শুরু হলো, যে ব্যথা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের মধ্যে ছিলো। لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 'যদি এই কাফেররা ঈমান না আনে তাহলে মনে হয়, আপনি নিজের জীবনকে শেষ করে দিবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ব্যথা আর অস্থিরতার মতো অস্থিরতাই তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো। এই পেরেশানির কারণে তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেলো যে, এখন ইসলামের কী হবে?

এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় স্বীয় ওয়াদা পূরণ করলেন। والله متم نوره 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূরকে পূর্ণতা দান করবেন।'

আল্লাহ তা'আলা একই সময়ে সমস্ত বুযুর্গ বান্দাগণের অন্তরে ইলহাম করলেন। দিল্লী, দেওবন্দ, করাচী, লাহোর এবং আপনাদের ঢাকা ও এরকম যত বড় বড় জায়গায় যত আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীন ছিলেন, ইসলামের ভবিষ্যত-চিন্তায় যাদের অন্তর পেরেশান ছিলো, চোখ ক্রন্দনরত ছিলো, সে সকল প্রিয় বান্দাগণের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এ কথা ঢেলে দিলেন যে, এখন কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করো। এমন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করো, যার পৃষ্ঠপোষক কোনো বাদশাহ, আমীর কিংবা নবাব হবে না; বরং এর অভিভাবক হবে রাস্তাঘাটের পথচারী মুসলমান, ক্ষেত-খামারের খেটেখাওয়া মুসলমান, হাটবাজারের ব্যবসায়ী মুসলমান। তারা এক টাকা, দুই টাকা, চার-পাঁচ টাকা দিবে; এতেই মাদরাসা চলবে। সেই চিন্তার ফসলই তো আজ এখানে দণ্ডায়মান। সারা বাংলাদেশে এবং ভারত ও পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ মাদরাসা রয়েছে, যেগুলো সরকারের কোনোরূপ সহযোগিতা কিংবা কোনো আমীর, নবাব বা খানসামার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই চলছে; বরং সাধারণ মুসলমানরাই এই মাদরাসাগুলোকে চালাচ্ছে এবং খুব শানদারভাবে এগুলোকে চালিয়ে নিচ্ছে।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় স্বীয় ওয়াদা পূরণ করেছেন। বনু উমাইয়ার রাজত্ব কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, সময়ের পালাবদলে বনু আব্বাসিয়াও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মোগলসহ আরো কত কত প্রতাপশালী রাজবংশ ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে; কিন্তু ইসলাম আজো যিন্দা এবং স্বমহিমায় ভাস্বর রয়েছে।

মাদরাসা কী ও কেন?

এটাই হলো কওমী মাদরাসা। এখানে মুসলমানদের ঈমানের হেফাযত করা হয়। আমরা পড়াই। তোমরা মাদরাসায় থেকে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফসহ আরো অনেক বড় বড় কিতাব পড়ো। কিন্তু যখনই ইসলামের ওপর কোনো আঁচড় লাগে, তৎক্ষণাৎ মাদরাসার তলাবারা বুখারী-মুসলিম বন্ধ করে রাজপথে নেমে যায়। আমাদের আকাবিরগণ এই দরসগাহে আবদ্ধ থাকার জন্য কওমী মাদরাসা কায়েম করেননি; বরং ইসলামের হেফাযতের জন্য এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামের জন্য যেখানেই প্রয়োজন হবে, আমাদের আসাতিযা ও তলাবা সকলেই সেখানে চলে যাবে।

মাওলার নির্বাচন, বান্দার সৌভাগ্য

ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর শত্রুতার ধারা সর্বযুগেই অব্যাহত ছিলো। আজ পর্যন্ত ইসলামের সামান্যতম ক্ষতি হয়নি। মার্কিন নরপিশাচেরা যখন ইরাকে হামলা করেছিলো তখন দশ লক্ষাধিক দুধশিশুকে শহীদ করা হয়েছিলো। সতেরো বছরের আফগান যুদ্ধে কত হাজার বান্দা শহীদ হয়ে গেছেন তার হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু দশ-বিশ লক্ষ মুসলমানকে নির্মমভাবে শহীদ করা আর পুরো দেশটাকে ধ্বংস করা ছাড়া তারা আর কী পেয়েছে? আমাদের জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করতে পারাকেই আমরা সৌভাগ্যজনক মনে করি। إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة আল্লাহ তা'আলা আমাদের জান ও মালকে পবিত্র বানিয়ে তাঁর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য কবুল করে নিয়েছেন। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে!

উহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিলো। তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 'মনোবল হারিও না, হতোদ্যম হয়ো না; তোমরাই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তোমরাই বিজয়ী হবে।' সত্তরজনের গর্দান কাটা যাওয়ার পরও এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখমী হওয়া সত্ত্বেও কুরআন বিজয় ও সম্মানের আগাম ঘোষণা দিয়েছে! কারণ, সাময়িকভাবে পরাজিত হওয়া বা বিজয়ী হওয়া চূড়ান্ত কিছু নয়। تلك الأيام نداولها بين الناس 'এই উত্থান-পতনের সাথেই আল্লাহ তা'আলা যামানাকে চলতে দেন।' উহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের কয়েকটি ফায়দা ও হেকমত কুরআন বর্ণনা করেছে। তন্মধ্যে একটি হলো, ويتخذ منكم شهداء 'উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য হতে কিছু শহীদ নির্বাচন করতে চেয়েছেন।'

কাজেই জান অথবা মালের কুরবানী আমাদের জন্য সৌভাগ্যজনক। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. যখন ইরানের উপর হামলা করেছিলেন তখন সেখানে এই পয়গাম লিখে পাঠিয়েছিলেন, أسلموا تسلموا 'ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে নিরাপত্তা পাবে। অন্যথায় জিযিয়া দাও, তাহলে নিরাপদ থাকবে। তা-ও না হলে শুনে নাও, আমার সাথে এমন এক জামাআত রয়েছে, যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শহীদ হওয়া এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পছন্দনীয়, যতটা শরাব তোমাদের কাছে পছন্দনীয়।' মৃত্যু কাফেরদের কাছে অপছন্দের; কিন্তু মুসলমানদের জন্য আল্লাহর দীনের জন্য প্রাণ দেয়া সৌভাগ্যজনক এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়। মুসলমানরা তো আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় আমাকে শহীদ করা হবে, অতঃপর আবার আমাকে

জীবিত করা হবে, আবার শহীদ করা হবে, আবার জীবিত করা হবে, আবার শহীদ করা হবে।

ষড়যন্ত্রের পৌনঃপুনিকতা

দুশমনদের দুশমনীর এই ধারা চলতেই থাকে। ইরাক আফগানিস্তানের পর এখন তোমাদের পাশে আরাকানেও হচ্ছে। সেইসব পুরনো ষড়যন্ত্রই কেবল নতুন নতুন রং ও রূপে আসছে। চীন, মার্কিন ও ব্রিটিশসহ ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোট বেঁধে মুসলমানদের দেশের পর দেশ উজাড় করে ফেলে, বোমাবর্ষণ করে। আর যখন মুসলমানেরা দুর্বল হয়ে যায় তখন এদের আশ্রয় দান করে। সারা দুনিয়ায় এরা শান্তি ও নিরাপত্তার ঢোল বাজাতে থাকে যে, আমরা বিপন্ন লোকদের নিরাপত্তা দিয়েছি। এরপর কী হয়? নিজেদের দেশেই দেখো, আরাকানের মুহাজির মুসলমানদের সাথে সেখানে কী হচ্ছে। তারা নিজেরা মুসলমান, একটা মুসলিম দেশেই তাদের ক্যাম্প হয়েছে; কিন্তু সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, মুসলমানদের জামাআতকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি কম দেয়া হয়; পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের দল এবং পাদ্রীদেরকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি বেশি দেয়া হয়। ওখানে কী হচ্ছে? খ্রিস্টান মিশনারীগুলো পুনরায় তাদের মিশন চালাচ্ছে। ধর্মান্তরকরণ এবং খ্রিস্টবাদের প্রচার চলছে সেখানে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়। ইসলাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য আসেনি। ويأبى الله إلا أن يتم نوره আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে ব্যথা আর অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিবেন। আর এই ব্যথা আর অস্থিরতা সৃষ্টি হলেই আল্লাহ তা'আলা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে ব্যথা, অস্থিরতা আর পেরেশানি ছিলো, তেমন ব্যথা আর সেই পরিমাণ পেরেশানি আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হলে বিপ্লব সাধিত হবে।

দ্বিতীয় আয়াতের সারমর্ম

খুতবায় আরেকটা আয়াত পড়েছি। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে পয়গাম উম্মতের কাছে পৌঁছানোর জন্য দেয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিন। والله يعصمك من الناس 'এবং দুশমনদের থেকে আল্লাহ তা'আলা আপনার হেফাযত করবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের দিক দিয়ে এবং শারীরিক-ভাবেও, সর্বদিক দিয়ে উম্মতের চেয়ে শক্তিশালী ছিলেন। কাজেই যখন তাঁকে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছে দেয়ার কারণে যত বিপদ-বাধা আসবে, সবকিছু থেকে আল্লাহ তা'আলা হেফাযত করবেন, তাহলে এই উম্মত -যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী সন্তান- যখন আল্লাহ তা'আলার পয়গাম নিয়ে দাঁড়াবে তখন আল্লাহ তা'আলা কি স্বীয় হেফাযতের হাত উঠিয়ে নিবেন? আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হেফাযতের যে ওয়াদা করেছিলেন, এটা তাবলীগে দীনের যিম্মাদারীর কারণে ছিলো; কাজেই এই দীনের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ যখন আমাদের মতো দুর্বল অক্ষম লোকেরা করবে তখন এই খোদায়ী হেফাযত আমাদের সাথেও থাকবে।

যামানার নয়া ফিতনা

প্রত্যেক যামানায় নানা ধরনের ফিতনা চলতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত যত ভয়ংকর ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে, সব বাইরে থেকে এসেছে। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্য হতে কাউকে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এমন কাউকে নেয়া হয়েছে, মানুষের মধ্যে যার জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং আব্দুল্লাহ চকলারভীকেও বেছে নেয়া হয়েছিলো। আসলে কী হয়? টার্গেট করে ধরে ফেলা হয়। হয়তো বিক্রি হয়ে যায় অথবা নিজের কোনো দুর্বলতা শত্রুদের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে ব্ল্যাকমেইল হয়ে যায়। এরপর কেউ নবুওয়াতের দাবি করে, কেউ বেলায়াতের দাবি করে, কেউ খলীফা হওয়ার দাবি করে। এগুলো বর্তমান যুগের বড় বড় ফিতনা।

আমাদের নিজেদের একটা জামাআত, যাদেরকে আমাদের আকাবিরগণ তাঁদের মেহনত দ্বারা তাজা করেছিলেন দীনের ব্যাপারে গাফেল লোকদের কাছে দীন পৌঁছানোর জন্য, সেখানে একজন এসে বললেন, এখন থেকে কোনো হযরতজীর নির্বাচন হবে না; শূরায়ী নেযাম চলবে। ঠিক আছে, এভাবেই চলতে থাকলো। ধীরেধীরে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের যত শূরার সদস্য ছিলেন সবার ইন্তেকাল হতে থাকলো; কিন্তু নতুন কোনো শূরা সদস্যও নির্বাচন করা হয়নি। এভাবে বিশ বছরের মধ্যে সকলের তিরোধানের পর তিনি দাবি করে বসলেন, আমি আমীরুল মুমিনীন। আসলে বেছে নেয়া হয়েছে, ধরে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু কী মনে হয়? এর কারণে কি দীন মিটে যাবে? এই মাদরাসাগুলো, এগুলোর উলামা-মাশায়েখ এবং এই জানবায তলাবারা থাকতে কি এরা নিজেদের পিতামাতা, ভাইবোনদের ঈমান অনিরাপদ হতে দেবে? আল্লাহর কসম! আমরা অলিগলিতে ঘুরবো, বুখারী-মুসলিম রেখে পাড়ায়-মহল্লায় যাবো, আমাদের ভাইদের কাঁধে হাত রেখে তাদেরকে ঈমান আর ইসলাম শিখাবো, নবীজীর দীন চেনাবো আর বলবো, ভাই! এটাই সঠিক দীন; এদিক ওদিক যেও না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের হেফাযতের জন্য এই নেযাম কায়েম করেছেন। এই নেযামের সাথে আমরা আমাদের দীনের হেফাযত করবো।

শূরায়ী নেযাম : নিরাপদ ব্যবস্থা

আরেকটি কথা বলবো। বর্তমান যুগে মুসলমানদের জন্য শূরায়ী নেযাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নিরাপদ নয়। মাদরাসা হোক কিংবা যে কোনো দীনী আন্দোলন, তার যেন ১০, ২০, ৫০, ১০০ কিংবা ১০০০ শূরা সদস্য থাকে। কেউ আমীর হবে তো শূরার অধীনে হতে হবে। শূরায়ী নেযাম হলে তা কেনা যায় না, তাকে নত করা যায় না। কিন্তু শূরা ছাড়া একজন ব্যক্তির হাতে সম্পূর্ণ যিম্মাদারী ছেড়ে দিলে যে কোনো সময় তাকে ক্রীড়নক বানিয়ে নেয়ার আশংকা থাকে। কাজেই এই ফিতনার যুগে দীনের হেফাযতের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো, وأمرهم شورى بينهم 'তাদের সব কাজ শূরায়ী হবে।'

এখন তো ফিকহ একাডেমীগুলোও শূরায়ী নেযাম অনুযায়ী চলছে। ফিকহ একাডেমীর কোনো একজন মুফতী সিদ্ধান্ত দেন না; বরং হাজারো মুফতিয়ানে কেরামের কনফারেন্স হয়, তারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফতওয়া দেন। কাজেই শূরা হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী– এটাই উত্তম পদ্ধতি। অন্যথায় একজনের উপর যিম্মাদারী থাকলে সে নিজের কোনো দুর্বলতার কারণে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে শত্রুর শিকার হয়ে যাবে।

উপসংহার

কুরআনে কারীমের যে আয়াত আমি তিলাওয়াত করেছিলাম, এটা মুসলমানদের ইতিহাস, কওমী মাদরাসার ইতিহাস। এটাই আমি এতক্ষণ যাবত খুলে খুলে বর্ণনা করলাম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানার এবং বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা সা'দ আরাফাত
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর,
হাজারীবাগ, ঢাকা।

আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানী ফিতনা : আমাদের করণীয়

মুফতী জহীরুল ইসলাম

আকীদায়ে 'খতমে নবুওয়াত' কী ও কেন?

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর শরীয়তই শেষ শরীয়ত। কিয়ামত পর্যন্ত বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখণ্ড নির্বিশেষে প্রত্যেক মানব সন্তানের জন্য তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য অপরিহার্য। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে একদিক দিয়ে যেমন নবুওয়াতের ধারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে এর প্রয়োজনও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁর শরীয়তের পর আর কোন শরীয়তের প্রয়োজন নেই এবং কারো জন্য নবী হওয়ার পথও খোলা নেই। কেউ যত ভাল মানুষই হোন, যত বড় পণ্ডিত ও শিক্ষিত হোন, যত বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানী হোন এবং যতই জনপ্রিয় ও সমাদৃত হোন, তার জন্য নবী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন সর্বশেষ নবী।

এটি মুসলমানদের একটি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় এটি 'খতমে নবুওয়াত আকীদা' নামে পরিচিত। এর উপর ইসলামের ভিত্তি এবং ঈমানের বুনিয়াদ। যার এ বিশ্বাসে ত্রুটি থাকবে তার ঈমান বহাল থাকার কোন অবকাশ নেই। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের অস্তিত্ব ও ঐক্য এই আকীদার উপর নির্ভরশীল। মুসলমানদের এই বিশ্বাস কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শরীয়তের এ বিশ্বাসের উপরই পরকালীন মুক্তি ও সফলতা পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই বিশ্বাস যদি বদ্ধমূল না থাকে তাহলে কুরআনে কারীমের উপর পূর্ণ আস্থা থাকবে না। আর হাদীস শরীফের আইনী মর্যাদাও বহাল থাকবে না। তাই প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য। এই বিশ্বাসে দৃঢ়তা অর্জন করা ছাড়া ঈমানে পূর্ণতা অর্জন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস ছাড়া যেমন ঈমানের কোন মূল্য নেই, তেমনি খতমে নবুওয়াতের বিশ্বাস ছাড়া ইসলামের কোন মূল্য নেই। ইসলামে খতমে নবুওয়াতের আকীদা ঐরকমই অকাট্য, সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত যেমন অকাট্য, সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত নবুওয়াতের আকীদা। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়া এবং আখেরী নবী হওয়া দু'টো আকীদাই সমান অকাট্য। এটি দীনে ইসলামের মুতাওয়াতির (তথা প্রজন্ম পরম্পরায় সুপ্রমাণিত) বিষয়সমূহের অন্যতম।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আকীদায়ে 'খতমে নবুওয়াত'

খতমে নবুওয়াতের আকীদাটি ইসলামের মৌলিক আকীদা হওয়ার কারণে কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে এবং বহু হাদীসে তা বিবৃত হয়েছে। পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম ও বিশ্ববরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. তার 'খতমে নবুওয়াত' গ্রন্থে কুরআনে কারীমের একশত আয়াত ও দুইশত হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলো সুস্পষ্টভাবে খতমে নবুওয়াতের আকীদা প্রমাণ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন মাজীদে 'খাতামুননাবিয়্যীন' ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ.

অর্থ : মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন বয়স্ক পুরুষের পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। (সূরা আহযাব-৪০)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বহু হাদীসে খতমে নবুওয়াতের আকীদা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন, আমার ও নবীদের উদাহরণ এমন একটি প্রাসাদ, যা খুব সুন্দর করে বানানো হয়েছে। তবে তাতে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দেয়া হয়েছে। দর্শকবৃন্দ ঘরটি ঘুরে-ফিরে দেখে, আর ঘরটির নির্মাণসৌকর্য সত্ত্বেও সেই একটি ইটের খালি জায়গা দেখে আশ্চর্যবোধ করে (যে, এমন সুন্দর প্রাসাদে একটি ইটের জায়গা কেন খালি রইল? জেনে রাখো,) আমিই সেই খালি জায়গা পূর্ণ করেছি। আমার দ্বারা সেই প্রাসাদের নির্মাণ পরিসমাপ্ত হয়েছে। আর আমার দ্বারা রাসূলদের সিলসিলা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি হলাম সেই খালি জায়গার পরিপূরক ইটখানি। আর আমি হলাম সর্বশেষ নবী। (বুখারী শরীফ; হা.নং ৩৩৪২, মুসলিম শরীফ; হা.নং ৬৫)

তিনি অন্যত্র বলেন, অন্যান্য নবীর তুলনায় আমাকে ছয়টি বিষয় দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে–

১. আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' তথা সর্বমর্মী বচন (অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের যোগ্যতা) দান করা হয়েছে। ২. আমাকে গাম্ভীর্যজনিত প্রভাব-প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।

৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

৪. গোটা ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য নামায পড়ার উপযোগী জায়গা এবং (পানির অনুপস্থিতিতে মাটিকে) পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ হিসেবে স্থির করা হয়েছে।

৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬. আমার দ্বারা নবীদের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। (মুসলিম শরীফ; হা.নং ৫২৩)

নবীজী আরও বলেন, (অর্থ:) বনী ইসরাঈলকে নেতৃত্ব দিতেন তাদের নবীগণ। যখনই তাদের কোন নবীর ইন্তেকাল হতো, তখন অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। তবে আমার পর আর কোন নবী নেই। অবশ্য অনেক খলীফা হবেন। (বুখারী শরীফ; হা.নং ৩৪৫৫, মুসলিম শরীফ; হা.নং ১৮৪২)

অন্য আরেকটি হাদীসে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, (অর্থ:) আমি সর্বশেষ নবী আর তোমরা সর্বশেষ উম্মত। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪০৭৭)

সুতরাং যেহেতু কুরআনের বহু আয়াত ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু হাদীস দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়া সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তাই যখনই কোন ব্যক্তি নিজের নবুওয়াতের দাবি দ্বারা এ আকীদা-বিশ্বাসে চিড় ধরাতে চেষ্টা করেছে, তখনই উম্মতের সকল উলামায়ে কেরাম একমত হয়ে তাকে কাফের ও মুরতাদ চিহ্নিত করেছেন। এজন্যই সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে যে কোন ইসলামী হুকুমত বা ইসলামী আদালতে কোন মিথ্যুক ভণ্ড নবীর মামলা উত্থাপিত হলে নবী দাবীর পক্ষে দাবীদারের কোন দলীল-প্রমাণ আছে কিনা, এই তত্ত্ব-তালাশ নেবার কোনই প্রয়োজন বোধ করা হয়নি; বরং শুধুমাত্র

নবী দাবী করার কারণেই তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কাফের ও মুরতাদদের সঙ্গে যে আচরণ করার শরয়ী বিধান রয়েছে, তাদের সঙ্গেও সে আচরণই করা হয়েছে।

ইসলামের সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে এই বিশ্বাস দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এজন্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে যে কেউ কোন ধরনের নবুওয়াতের দাবী করবে সে মিথ্যুক, দাজ্জাল, মুরতাদ ও হত্যাযোগ্য; ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বহু হাদীসে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

একটি হাদীসে তিনি বলেন, (অর্থ:) প্রায় ত্রিশজন চরম মিথ্যবাদী প্রতারকের আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। এদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭১২১)

তিনি আরো বলেন, (অর্থ:) নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন চরম মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী। অথচ আমি খাতামুননাবিয়্যীন; আমার পরে আর কোন নবী নেই। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪২৪৯)

সুতরাং কেউ যদি একথা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও নবী আসতে পারে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ওহীর দরজা এখনও খোলা আছে, বন্ধ হয়নি। সুতরাং আসমান থেকে নতুন নতুন বিধান আসতে থাকবে। ফলে পূর্বের বিধানের কোন মূল্য থাকবে না এবং পূর্বের নবীর শরীয়ত মানারও কোন দরকার হবে না। উদাহরণত হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কত বড় নবী ছিলেন! আমরা তাকে নবী হিসাবে ঠিকই বিশ্বাস করি। তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তা-ও বিশ্বাস করি। কিন্তু তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিধানাবলী আমরা পালন করি না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর সেগুলো আমলযোগ্য নয়। কাজেই, এখন যদি একথা মনে করা হয় যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আরও নবী আসতে পারে, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটবে। অর্থাৎ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব কুরআনের কোন মূল্য থাকবে না। তাঁর প্রতি নাযিলকৃত শরীয়তেরও কোন আবেদন থাকবে না এবং তাঁকে রাসূল হিসাবে মান্য করারও কোন অর্থ থাকবে না। এসব কিছু অর্থবহ করতে হলে তাঁকে রাসূল হিসাবে মান্য করার সাথে সাথে একথাও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসতে পারে না। বরং নবী আগমনের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আকীদায়ে খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণের গুরুত্ব

এ আকীদা সংরক্ষণ মামুলী কোন বিষয় নয়; বরং দীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ। হযরত সাহাবায়ে কেরামের মেহনত ও কুরবানী থেকেও বুঝা যায় যে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সীরাতবেত্তাদের সর্বসম্মত মত হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যতগুলো জিহাদ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোতে সর্বমোট তিনশত পঁচাত্তর বা আশি জন অর্থাৎ চারশতেরও কম সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন; পক্ষান্তরে ভণ্ড ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে 'খতমে নবুওয়াতের' আকীদা সংরক্ষণের জন্য খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর রাযি. হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে এগারোশত সাহাবীকে আল্লাহর তা'আলা শহীদ হওয়ার মর্যাদা দিয়েছিলেন। আবার তন্মধ্যে শুধু কুরআনের হাফেযই ছিলেন সাতশত।

এছাড়া হযরত ওয়াহশী রাযি. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয় চাচা হযরত হামযা রাযি.-কে যে খঞ্জরটি দিয়ে শহীদ করেছিলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর এ যুদ্ধে শরীক হয়ে সেই খঞ্জর দিয়েই মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করে 'খতমে নবুওয়াতের' আকীদা সংরক্ষণের ফরয দায়িত্ব আদায় করেছিলেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, খতমে নবুওয়াতের আকীদা সংরক্ষণ করা সাহাবায়ে কেরামের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সুতরাং ইসলামের উল্লিখিত মৌলিক ও অকাট্য আকীদা-বিশ্বাসের মোকাবেলায় কেউ যদি নবী হওয়ার দাবি করে তবে সেটা মুসলিম সমাজের নিকট অগ্রাহ্য ও মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। শুধু তাই নয়; এরূপ দাবী পোষণকারী ব্যক্তি ইসলামের সর্ববাদী বিশ্বাস অনুযায়ী শুধু অমুসলিমই নয়; বরং সন্দেহাতীতভাবে কাফের, মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত হবে এবং যে এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করবে সে-ও কাফের-মুরতাদ বিবেচিত হবে।

কাদিয়ানী ফিতনার প্রেক্ষাপট

নবুওয়াতের যমানা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এ বুনিয়াদী আকীদা হরণ করার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের চির শত্রু ইয়াহুদী-খ্রিস্টান অপশক্তি ও তাবৎ খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তি ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে আফ্রিকার প্রত্যন্ত জনপদ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে অত্যন্ত সুক্ষ্ম কৌশলে চক্রান্ত চালিয়ে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে সৃষ্টি করা হয়েছে বেশ কিছু ভণ্ড নবী। মুসাইলামাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদে আনাসী, তুলাইহা, সাজ্জাহ ও হারেছ থেকে শুরু করে ইংরেজপোষ্য মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী পর্যন্ত মিথ্যা নবুওয়াতের এ ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা যখন উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল, আর তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়নের জন্যে মুসলমানরা সংগ্রাম, আন্দোলন ও সর্বাত্মক জিহাদের ডাক দিয়েছিল তখন ইংরেজরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্যে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, হত্যা, ধ্বংস, জুলুম-নির্যাতন চালানোর পরও যখন মুসলমানদের ঈমান-আকীদার ভিত উপড়ে ফেলা যায়নি; পর্যুদস্ত, শীর্ণ কঙ্কালের মধ্যেও যখন প্রতিরোধের ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে, তখন তারা মুসলমানদের জিহাদী আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়ার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং তাদের অন্তর থেকে জিহাদের স্পৃহা নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য বহু ফিতনার উদ্ভব ঘটায়।

তাদের সর্বাপেক্ষা বড় লক্ষ্য ছিল, ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণকে সর্বশেষ, সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন নবী, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিরাগভাজন করে একজন 'ভারতীয় নবী'-র অভিমুখী করা। তাদের বিশ্বাস ছিল, এটা করতে পারলে মুসলিম উম্মাহর ঈমানী শক্তি অনেকটা খর্ব হবে এবং তারা এই ফিতনার দিকেই বেশি মনোযোগী থাকবে। ফলে ইংরেজ বিরোধী জিহাদী জোশ ও জযবা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়বে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াত দাবী

এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্রিটিশরা মুসলমানদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ধর্মীয় ব্যক্তি খুঁজে বের করার জন্য গোটা উপমহাদেশে ব্যাপক জরিপ চালায়।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ভারতের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাদের এজেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তাই তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, জিহাদী চেতনা নস্যাৎ ও গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার জন্য মির্জা গোলাম আহমদকে অর্থ-বিত্তের বিনিময়ে এজেন্ট নিয়োগ দেয়।

এই লোকটি তৎকালীন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে ১৮৪০ ঈসাব্দে জন্মগ্রহণ করে। সে ব্যক্তিগতভাবে মাধ্যমিক ক্লাস পর্যন্ত উর্দু, ফার্সী, আরবী, ও কিছু ইংরেজী পড়ার পর শিয়ালকোট আদালতে কেরানীর চাকুরী শুরু করে। সে একদিকে যেমন তার অন্নদাতা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের মনোরঞ্জন ও গুণকীর্তনে লিপ্ত ছিল। অপরদিকে কুরআন-হাদীস তথা ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ কিছু লোককে পথভ্রষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছিল।

ব্রিটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী সে নানা কলা-কৌশল অবলম্বন করে সরলমনা অনেক মুসলমানকে তার ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়। কিছু ভক্ত জুটে যাওয়ার পর প্রথমে সে নিজেকে ইসলাম প্রচারক বলে দাবি করে। অতপর নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। তারপর নিজেকে ইমাম মাহদী ঘোষণা করে। এরপর একসময় নিজেকে মাসীহে 'প্রতিশ্রুত ঈসা' বলে দাবি করে। এরপর পর্যায়ক্রমে নিজেকে যিল্লি নবী, বুরুজী নবী, সহায়ক নবী ও সবশেষে স্বতন্ত্র নবী বলে দাবি করে বসে।

সে একদিকে ইসলামের সম্মানের প্রতীক ফরয জিহাদকে রহিত বলে ফতোয়া দেয় এবং ব্রিটিশ হুকুমতকে আল্লাহর রহমত বলে প্রচারণা চালায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে তার অন্তরালে একটি তথাকথিত ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। আর যারা তাকে মাহদী, প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ ও নবী-রাসূল বলে বিশ্বাস করে না তাদেরকে কাফের ও জারজ সন্তান এবং তাদের মহিলাদেরকে পতিতা আখ্যা দেয়।

মির্জা গোলাম আহমদে কাদিয়ানীর কয়েকটি জঘন্য উক্তি

১. আমাদের মাযহাব হল, যেই ধর্মে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা নেই সে ধর্ম মুর্দা (মরা)। (মালফূযাত ১/১২৭)

২. একজন মেথরও নবী-রাসূল হতে পারে। (রূহানী খাযাইন ১৫/২৭৯)

৩. শয়তানী কথাবার্তার অনুপ্রবেশ নবী-রাসূলগণের ওহীর মধ্যেও হয়ে যায়। (রূহানী খাযাইন ৩/৪৩৯)

৪. محمد رسول الله والذين معه কুরআনের এ ওহীর মধ্যে আমার নাম মুহাম্মাদ এবং রাসূল রাখা হয়েছে। (রূহানী খাযাইন ১৮/২০৭)

৫. আমার দাবী হল, আমি নবী ও রাসূল। (আনওয়ারুল উলূম ২/৫১৫)

৬. সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছেন। (রূহানী খাযাইন ১৮/২৩১)

৭. আমি ঐ খোদার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন। (রূহানী খাযাইন ২২/৫০৩)

৮. আমি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নবী, যদি আমি তা অস্বীকার করি তাহলে আমার গোনাহ হবে। যে অবস্থায় খোদা আমার নাম রেখেছেন আমি তা কিভাবে প্রত্যাখ্যান করি। আমি এর উপর মরণের পূর্ব পর্যন্ত অটল থাকব। (হাকীকাতুন নবুওয়াহ, মির্জা মাহমূদ; পৃষ্ঠা ২৭১)

৯. আমি রাসূল ও নবী অর্থাৎ পূর্ণ ছায়া স্বরূপ। আমি ঐ আয়না যাতে মুহাম্মাদী আকৃতি ও মুহাম্মাদী নবুওয়াতের পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। (নুযূলে মসীহ; পৃষ্ঠা ৩, প্রথম সংস্করণ)

১০. আমার এ কদম এমন এক মিনারার উপর যা সর্ব উর্ধ্বে। (রূহানী খাযাইন ১৬/৭০)

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা

কাদিয়ানী মতবাদ খাতামুননাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মান-ইজ্জত ও মর্যাদার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহী তরবারী। কেননা ঈমানের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর যে কোন অংশ অস্বীকারকারী, অথবা যে কোন অংশের সর্বস্বীকৃত ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদানকারী সন্দেহাতীত কাফের। কাদিয়ানী সম্প্রদায় যেহেতু গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবীরূপে বিশ্বাস করে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন-ঘোষিত পরিচয় 'খাতামুন-নাবিয়্যীন'-এর সর্ব-কালের সর্বস্বীকৃত ব্যাখ্যা 'তিনি সর্বশেষ নবী'-এর অপব্যাখ্যা করে ঈমানের কালিমার শেষ অংশের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে, তাই ইসলামী আকীদা মোতাবেক কাদিয়ানীরা কাফের; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পবিত্র কাবা শরীফের ইমাম সাহেবানসহ বিশ্বের সকল নেতৃস্থানীয় উলামা ও মুফতিয়ানে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে ইসলাম বহির্ভূত ও কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম (সংখ্যালঘু) বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য, একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো এবং ব্যাপক জনমত তৈরির মাধ্যমে তা ঘোষণা করিয়ে নেয়া।

যেসব রাষ্ট্রের সরকারী সিদ্ধান্তে কাদিয়ানীরা কাফের

১৯৫৭ ঈসায়ী সনে সিরিয়া সরকার কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে অমুসলিম ও সংখ্যালঘু ঘোষণা করেন এবং কাদিয়ানীদের সংগঠনকে অবৈধ ও বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা দেন।

১৯৫৮ ঈসায়ী সনে মিসর সরকার কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে কাফের, মুরতাদ এবং তাদের সংগঠনকে বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৯৭৪ ঈসায়ী মোতাবেক ১৩৯৪ হিজরীর ১৪ রবিউল আওয়াল থেকে ১৮ রবিউল আওয়াল পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী ১০৪টি দেশের সম্মিলিত সংগঠন 'রাবেতা আলমে ইসলামী'-এর অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, এ দলটি কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত, তাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী হারাম। তাদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক তথা সর্বক্ষেত্রে বয়কট করা হোক এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাদের দাফন না করা হোক। উক্ত প্রস্তাবসমূহ পৃথিবীর ১০৪টি দেশের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে অনুমোদন করেছেন। এসব দেশের মধ্যে সৌদি আরব, দুবাই, আবুধাবী, কাতার প্রভৃতি দেশও অন্তর্ভুক্ত।

২৮ এপ্রিল ১৯৭৩ ঈসাব্দে আযাদ কাশ্মীরের অ্যাসেম্বলী কাদিয়ানীদের কাফের হওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ঈসাব্দে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়েছে।

৬ নভেম্বর ১৯২৩ ঈসাব্দে ভারতের দিল্লীতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এক অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়, লাহোরী ও আহমদী উভয় জামাআতের আকীদা ইসলাম বহির্ভূত এবং উভয় জামাআত কাফের।

মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উলামা-মাশায়েখের ফাতওয়ায় 'কাদিয়ানীরা কাফের'

১৩০১ হিজরী সনে বরেণ্য মুহাদ্দেস মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতবী রহ. (প্রথম প্রধান শিক্ষক, দারুল উলূম দেওবন্দ) মির্জা কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদেরকে দাহরিয়া তথা কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১৩০১ হিজরী সনে দারুল উলূম দেওবন্দের তৎকালীন সকল মুরুব্বী একমত হয়ে কাদিয়ানীদেরকে মুরতাদ,

জিন্দিক, মুলহিদ ও কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১৩০২ হিজরী সনের রজব মাসে মুফতীয়ে আজম ভারত হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান উসমানী রহ. কাদিয়ানীরা কাফের এ কথার উপর বিস্তারিত একটি ফতোয়া ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন।

১৫ জুন ১৯০৯ ঈসাব্দে হযরত মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী রহ. ভারতের রামপুরের এক তর্কানুষ্ঠানে কাদিয়ানীদের পরাজিত করে প্রমাণ করেছেন যে, তারা কাফের।

১৯৩৫ ঈসাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি ভাওয়ালপুর কোর্টে এক ঐতিহাসিক চাঞ্চল্যকর মামলায় আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. ও অন্যান্য উলামায়ে দেওবন্দের বিস্তারিত দলীলের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ আকবর নামক একজন জজ সাহেব কাদিয়ানীদেরকে মুরতাদ ও কাফের বলে রায় দিয়েছেন।

১৩৪৩ হিজরী সনে আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. স্বীয় ছাত্রদের সাথে নিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করে কাদিয়ানীদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

১৯৩০ ঈসাব্দের মার্চ মাসে আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. 'খতমে নবুওয়াত' সংগঠনের উদ্যোগে এক আজীমুশশান সম্মেলন করেন এবং তিনি সহ পাঁচশত আলেম একসাথে হযরত মাওলানা শাহ্ আতাউল্লাহ্ বুখারী রহ.-এর হাতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

১৯৫৩ ঈসায়ী থেকে হযরত মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ্ বুখারী রহ. ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জলন্ধরী রহ.-এর নেতৃত্বে 'খতমে নবুওয়াত' আন্দোলন চলতে থাকে এবং উক্ত আন্দোলনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ হাজার আশেকীন শাহাদাত বরণ করেন এবং হাজার হাজার নবীপ্রেমিক মুজাহিদ কারাবরণ করেন।

১৯৭৪ ঈসাব্দে আল্লামা ইউসুফ বানোরী রহ.-এর নেতৃত্বে নবীপ্রেমিক মুজাহিদগণ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবী আদায় করেন।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীসহ তার অনুসারীরা কাফের– একথা কীভাবে বুঝবো?

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীসহ তার সকল অনুসারী যে কাফের তা সহজে বুঝার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে–

প্রথমত প্রত্যেক নবীর জন্য অপরিহার্য হলো তিনি তার পূর্বেকার সকল নবীকে সম্মান করবেন এবং অন্যান্য লোকদেরকেও তাদের আদব-সম্মান করার বিষয়টি শিক্ষা দিবেন। কারণ, পয়গম্বরগণ হলেন আল্লাহর নায়েব বা প্রতিনিধি। কাজেই, কোন নবীকে অসম্মান ও অপমান করা কোন সাধারণ মুমিনের জন্যও বৈধ নয়।

কিন্তু মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আমরা দেখি, তিনি আল্লাহর সত্য ও মহামর্যাদাবান নবী সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আ.-এর শানে খুবই অভদ্রোচিত কথাবার্তা বলেছেন ও লিখেছেন। তিনি তার 'দাফিউল বালা' ও 'রূহানী খাযাইন' নামক গ্রন্থের ১৮/২২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মসীহ-এর সততা তার যুগের অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত হয় না; বরং তার চেয়ে ইয়াহইয়া নবীর একগুণ বেশি ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। কেননা, তিনি মদ পান করতেন না এবং তার ব্যাপারে কখনো একথা শোনা যায়নি যে, কোন পতিতা স্বীয় উপার্জিত অর্থে খরিদকৃত আতর তার মাথায় মালিশ করেছিল কিংবা নিজ হাত ও মাথার কেশ তার শরীরে লাগিয়েছিল বা কোন অপরিচিত যুবতী তার খেদমত করত। উক্ত কারণে আল্লাহ কুরআনে ইয়াহইয়ার নাম 'হাসূর' রেখেছেন। কিন্তু তিনি মসীহর এ নাম রাখেননি। কেননা, উল্লিখিত কাজগুলি তার এ নামকরণে প্রতিবন্ধক ছিল।' নাউযুবিল্লাহ।

উদ্ধৃত অংশটুকুতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের উপর কয়েকটি অপবাদ আরোপ করেছেন। ১. তিনি মদ পান করতেন। ২. তিনি পতিতাদের দিয়ে তাদেরই নাপাক আয় দ্বারা অর্জিত আতর নিজের মাথায় মালিশ করাতেন এবং তাদের হাত ও মাথার কেশ স্বীয় শরীরে লাগাতেন। ৩. অপরিচিত যুবতীরা তার খেদমত করত। (আল্লাহর পানাহ)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এখানে যেসব অশ্লীল কথা-বার্তা লিখেছেন কোন ভদ্র ও সৎ ব্যক্তি সম্পর্কেও এ ধরনের উক্তি করা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিটির জন্য চরম অবমাননাকর। সামান্য পরিমাণ ঈমান যার মধ্যে রয়েছে তার কলম থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে সজ্ঞানে এমন অশ্লীল ও অশোভন কথা বের হতে পারে না।

এছাড়া, মির্জা কাদিয়ানী তার 'যমীমা আনজামে এ্যাথাম' নামক গ্রন্থের ৭নং পৃষ্ঠায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এর চেয়েও আরো অশ্লীল ও জঘন্য কথা আরো অভদ্রজ ভাষায় লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তার (ঈসার) খান্দান ছিল অত্যন্ত পূতঃপবিত্র(?) তার তিনজন নানী ও দাদী ছিল পতিতা। পতিতাবৃত্তি করেই তারা অর্থোপার্জন করতো। আর এদের ভ্রুণেই অস্তিত্ব লাভ করেছেন তিনি। হতে পারে খোদা হওয়ার জন্য এটাও একটা শর্ত(?) পতিতাদের সঙ্গে তার মেলা-মেশা ও তাদের প্রতি তার অনুরাগও সম্ভবত উক্ত বংশগত টানেই হয়েছিল। অন্যথায় কোন সৎ ব্যক্তি এক যুবতী পতিতাকে এতটুকু সুযোগ দিতে পারে না যে, সে তার নাপাক হাত তার মাথায় লাগাবে এবং পতিতাবৃত্তি দ্বারা উপার্জিত অর্থে কেনা নাপাক আতর তার মাথায় মালিশ করবে। আর নিজের কেশগুচ্ছ দ্বারা তার পা মুছে দিবে।' (নাউযুবিল্লাহ।)

বলাবাহুল্য, এখানেও হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি তার বর্ণনাভঙ্গি শালীনতার সকল সীমা অতিক্রম করেছে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর কোন সাচ্চা পয়গম্বরের পক্ষে নিজের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য ভুলেও কখনো মিথ্যা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মির্জা কাদিয়ানীকে এ বিষয়ে খুবই বল্গাহীন দেখা যায়। তিনি অবলীলাক্রমে ও দ্বিধাহীনচিত্তে নির্জলা মিথ্যা বলে যান। যেমন: তিনি 'আরবাঈন' নামক গ্রন্থের ১১নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসূরী ও মৌলভী ইসমাঈল আলীগড়ী আমার সম্পর্কে এ মর্মে চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছেন যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে আমাদের পূর্বে মারা যাবে। কেননা সে একজন মিথ্যাবাদী। কিন্তু তাদের গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর তারাই খুব দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।'

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে মৌলভীদ্বয় সম্পর্কে মির্জা সাহেব যে বলেছেন 'তারা নিজ নিজ গ্রন্থে চূড়ান্ত ফয়সালা এই দিয়েছেন যে, সে (মির্জা কাদিয়ানী) যদি মিথ্যুক হয় তবে সে আমাদের পূর্বে মারা যাবে। আর যেহেতু সে মিথ্যুক তাই সে অবশ্যই আমাদের পূর্বে মারা যাবে।' তিনি আরো বলেছেন, যে গ্রন্থে তারা এ ফায়সালার কথা লিখেছেন তা প্রকাশিত হয়েছে।

মির্জা সাহেবের এ সকল কথা মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কারণ, উল্লিখিত মৌলভীদ্বয়ের এমন কোন গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠে নেই যার মধ্যে তারা উক্ত ফয়সালা দিয়েছেন। মির্জা সাহেবের জীবদ্দশায় তাকে এর সন্ধান দিতে বলা হয়েছিল এবং তার অনুসারীদেরকে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত তা মোকাবেলা করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। একইভাবে তিনি তার অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে নিজের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে এ ধরনের অসংখ্য ভিত্তিহীন বানোয়াট ও বাস্তবতা বিবর্জিত কথাবার্তা নির্দ্বিধায় বলে গেছেন। এমন ব্যক্তিকে পয়গম্বর তো দূরের কথা, একজন সাধারণ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলেও আখ্যায়িত করা যায় না।

তৃতীয়ত তিনি এমনকিছু গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যেগুলোকে তিনি তার সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী হওয়ার মাপকাঠি নিরূপণ করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, যদি এটা বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তিনি মিথ্যুক। আল্লাহ তা'আলা তার এ ধরনের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বানীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে তাকে মিথ্যুক ও প্রতারক হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অন্যথায় গণক ও জ্যোতিষীদেরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে। এ কারণে মির্জা সাহেবের এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী শতভাগ বাস্তবায়িত হলেও আমরা তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তেমনি অবকাশ বলে মনে করতাম যেমন অবকাশ দেয়ার কথা হাদীস শরীফে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, দাজ্জাল নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং মৃতকে জীবিত করে দেখাবে। এসব সত্ত্বেও সে দাজ্জালই হবে। নিম্নে তার একটি ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরা হল।

তিনি ডেপুটি আব্দুল্লাহ অ্যাথম নামক জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে বলেন, 'সে ৫ জুন ১৮৯৩ ঈসায়ী থেকে পনেরো মাস অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ ঈসায়ী পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করবে। (অ্যাথমের বয়স যেহেতু তখন সত্তরের কাছাকাছি, তাই উক্ত সময়ের মধ্যে তার মৃত্যুবরণ করা অসম্ভব কিছু ছিল না) কিন্তু মির্জাকে মিথ্যুক প্রমাণিত করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য। তাই বৃদ্ধ আব্দুল্লাহ অ্যাথম নির্ধারিত মেয়াদে মৃত্যুবরণ করেননি; বরং তার দু'বছর পর ২৭ জুলাই ১৮৯৬ ঈসাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মির্জা সাহেব স্বয়ং 'আনজামে অ্যাথম' নামক গ্রন্থে তার মৃত্যুর উক্ত তারিখ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যখন উক্ত মেয়াদে মৃত্যুবরণ না করে অ্যাথম সাহেব দু'বছর পর্যন্ত জীবিত থাকলেন তখন এই দুই বছরের প্রতিটা মুহূর্ত মির্জা কাদিয়ানীকে তারই স্বীকৃতি অনুযায়ী মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে চলেছেন।

চতুর্থত আল্লাহর কোন নবীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় যে, তিনি তার যুগে এমন কোন শক্তি ও প্রশাসনের তোষামোদকারী ও চাটুকার হবেন এবং এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করবেন যারা কুফর ও খোদাদ্রোহিতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং যাদের উন্নতি ও অগ্রগতিতে কুফর ও ধর্মহীনতার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে।

নিসঃন্দেহে পৃথিবীতে কাফের হুকুমত আরো ছিল। কিন্তু কখনো কোন হুকুমতের প্রভাব ও দাপট মানুষকে খোদা থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন এবং দীন ও আখেরাত থেকে এতটা বিমুখ-বেফিকির করতে পারেনি যতটা পেরেছিল এই ইংরেজ সরকার। ইংরেজরা সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষতিসাধন করেছে এবং যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছে তার পরিসংখ্যান পেশ করা সম্ভব নয়। যেসব দেশ মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল সেসব দেশ থেকে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে উৎখাত করে কোন জাতি ও কোন্ সরকার তাদেরকে গোলামে পরিণত করেছে? খতিয়ে দেখলে প্রায় সবগুলোতেই ইংরেজদের হাত খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই নবী আগমণের ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকতো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোন নবী আবির্ভূত হতেন তাহলে তিনি কখনো ইংরেজ সরকারের বিন্দুমাত্র প্রশংসা করতেন না এবং তাদেরকে খোদার অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ বলে আখ্যা দিতেন না; বরং তিনি তাদেরকে যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দেখা যায়, এ ব্যাপারে তার ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তিনি অতি হীন ও নিচু শ্রেণীর সরকারপূজারী ছিলেন। তিনি তার একাধিক লেখায় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক শুভাকাঙ্ক্ষা ও ওফাদারীর এমন ঘৃণিত ও জঘন্য পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা কোন নিচু থেকে নিচুতর সরকারপূজারীর লেখাতেও সচরাচর দেখা যায় না।

মির্জা কাদিয়ানী তার 'গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'গভর্নমেন্টের (অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের) অনুগ্রহ আমাদের খান্দানের উপর আমার পিতা গোলাম মোর্তজার সময় থেকেই বরাবর চলে আসছে। তাই গভর্নমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করেছে।'

তিনি আরো লিখেছেন, 'আমরা মহামান্য সরকারকে একথার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমরা এ সরকারের জন্য তেমনি একনিষ্ঠ, যেমন ছিলেন আমাদের গুরুজনরা। আমাদের হাতে এ ছাড়া আর আছেই-বা কী? সুতরাং আমরা দু'আ করছি, আল্লাহ যেন এ সরকারকে সব ধরনের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং শত্রুদেরকে লাঞ্ছনার সঙ্গে পিছপা করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনুগ্রহকারী সরকারের কৃতজ্ঞতা এমনি ফরয করেছেন, যেমন তার নিজের কৃতজ্ঞতা। সুতরাং আমরা যদি এই সরকারের প্রশংসা না করি অথবা মনে কোন অনিষ্ট ভাবনা পোষণ করি, তবে আমরা খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম না। কেননা, খোদার কৃতজ্ঞতা এবং এমন অনুগ্রহকারী গভর্নমেন্টের কৃতজ্ঞতা, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে নেয়ামত হিসাবে দান করেছেন মূলত এই দু'টি কাজ একই সূত্রে গাঁথা। একটা ছেড়ে দিলে অপরটা ছেড়ে দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। কতক নির্বোধ ও বোকা লোক প্রশ্ন করে যে, এই সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয কিনা? তাদের এ ধরনের প্রশ্ন চরম বোকামীর পরিচায়ক। কারণ, যার অনুগ্রহের শোকর করা একান্ত ফরয, তার বিরুদ্ধে আবার জিহাদ কিসের? আমি সত্যিই বলছি, উপকারকারীর অপকার ও অকল্যাণ কামনা একজন হারামী ও বদকার মানুষের কাজ বৈকি।'

বস্তুত ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু ইংরেজ হুকুমতের এমন ভূয়সী প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেবলমাত্র চরম হীনপ্রকৃতির ইংরেজ তল্পিবাহক ও তাদের পদলেহী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। নবী তো দূরের কথা, সাধারণ কোন মুসলমানের পক্ষেও এটা সম্ভব নয়।

উপসংহার

একসময় ধারণা করা হয়েছিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে তখন তাদের উদ্ভাবিত ও লালিত কাদিয়ানী ফিতনার মূলোৎপাটন হবে। কিন্তু অভিশপ্ত সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের রোপিত বিষবৃক্ষের অবশেষটুকু এই উপমহাদেশে তাজা রাখার লক্ষ্যে এবং নিজেদের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের সূত্র জিইয়ে রাখতে উদার পৃষ্ঠপোষকতায় কাদিয়ানীদেরকে শুধু বহাল রেখেছে তাই নয়; বরং দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে পর্যুদস্ত মুসলিম জনগণের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পদে পদে বাঁধাগ্রস্ত করার অসদুদ্দেশ্যে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রচার-প্রসার বহুগুণ বর্ধিত করেছে।

আজ আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই কাদিয়ানী কুচক্রী গোষ্ঠী ঢুকে পড়েছে। ক্রুসেডর খ্রিস্টীয়গোষ্ঠী তাদের আবিষ্কৃত এই ফিতনা ও ধর্মীয় আগ্রাসন কখনোই নিঃশেষ হতে দেবে না। তাই, সরলমনা মুসলমানদের ঈমানবিধ্বংসী ফিতনাকে মূলোৎপাটিত করতে এখনই ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামতে হবে। যুগপৎ প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মাধ্যমে এদেরকে অমুসলিম ও সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

লেখক : প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস,
জামি'আ ইসলামিয়া বাইতুন নূর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
খতীব, ওয়ার্লেস গেইট, চৌরাস্তা জামে মসজিদ,
মগবাজার, ঢাকা।

রমাযানের কিছু জরুরী মাসাইল

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

চাঁদ দেখার মাসাইল

বিমান বা হেলিকপ্টারে চড়ে চাঁদ দেখা

বিমান থেকে যেখানে চাঁদ দেখা গেছে, নিচে নেমে যদি ভূমি থেকে সেখানেই চাঁদ দেখা যায়, তাহলে শরয়ীভাবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিমানে করে এ পরিমাণ উঁচুতে চড়ে চাঁদ দেখা হয় যে, সেখানে উদয়স্থল পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ঐ খবর মানার দ্বারা মাস ২৮ দিনে হওয়া আবশ্যক হয় তাহলে বিমানে চড়ে দেখা চাঁদ গ্রহণযোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে যদি হেলিকপ্টারে চড়ে চাঁদ দেখা হয় এবং ঐ চাঁদ ভূমি থেকে না দেখা যায় তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা হেলিকপ্টার খুব বেশি উঁচুতে উড্ডয়ন করে না। কাজেই হেলিকপ্টারে চড়ে চাঁদ দেখা কোন উঁচু স্থান থেকে চাঁদ দেখার মতো। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৮, আল-উরফুশ শাযী শরহু সুনানিত তিরমিযী ২/১৪৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/২৮১)

চাঁদ দেখার ব্যাপারে রেডিও, টেলিভিশন, ফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদির খবরের বিধান

যদি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক বা শরয়ী হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে রেডিও, টেলিভিশনে চাঁদ দেখার ঘোষণা করা হয় এবং তার সত্যতার প্রবল ধারণা হয় তাহলে তা এতটুকু দূরত্ব পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে যেখানে তা মেনে নিলে মাস ২৯ দিন থেকে কম অথবা ৩০ দিন থেকে বেশি হওয়া আবশ্যক না হয়।

এমনিভাবে টেলিফোন বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে যদি খবর এমনভাবে পৌঁছায় যে, তার উপর ইয়াকীন হয়ে যায়, তাহলে সেই খবর গ্রহণযোগ্য হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৬, ৩৯০, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৫৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/২৮৫, ২৮৬)

চাঁদ দেখার ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়ার হুকুম

যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তওবা করে না কিংবা সগীরা গুনাহ বারংবার করে তাকে ফাসেক বলে। সুতরাং এমন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থার সাথে সাথে যদি তার কথাবার্তা, মু‘আমালাত শরীয়ত অনুযায়ী না হয়, তাহলে তার সাক্ষ্য কোন অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কথাবার্তা, মু‘আমালাত শরীয়ত অনুযায়ী হয়, তাহলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (সূরা তালাক-২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৯৪৬৯, ২১৭৪৩, আল-হিদায়া ১/১১৯, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৫, ফাতাওয়া কাযীখান ৮/৩৩২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/২৮৭)

সৌদি আরবে দেখা চাঁদ আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট নয়

জেনে রাখা উচিত, চাঁদের একটি কুদরতী আবর্তন ব্যবস্থা রয়েছে এবং মাসের প্রত্যেক দিনের জন্য একটি নির্ধারিত মনযিল রয়েছে। আর লম্বা ও চওড়ার দিক দিয়ে প্রত্যেক শহরের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উদয়স্থলের এ ভিন্নতা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কিনা?

এ বিষয়ে সমস্ত ফিকহী আলোচনার সারমর্ম হলো,

(ক) নিকটবর্তী শহরগুলোতে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। নিকটবর্তীর সীমা হলো, যেখানকার খবর গ্রহণ করলে মাস ২৯ দিন থেকে কম বা ৩০ দিনের বেশি হয় না।

(খ) দূরবর্তী শহরগুলোতে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে। আর দূরবর্তীর সীমা হলো, যেখানকার খবর গ্রহণ করলে মাস ২৯ দিন থেকে কম বা ৩০ দিনের বেশি হয়ে যায়। অতএব সে স্থানের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হবে না; তা যতই নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছুক না কেন। কেননা শরীয়তে কোন মাস ২৯ দিন থেকে কম এবং ৩০ দিনের বেশি হয় না।

উল্লিখিত দু'টি আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, সৌদি আরবে দেখা চাঁদ আমাদের দেশের জন্য ধর্তব্য হবে না, চাই তা যতই নির্ভরযোগ্য হোক না কেন। কেননা সেখানকার উদয়স্থল এখানকার থেকে ভিন্ন এবং সেখানখার খবর মানার দ্বারা আমাদের দেশের উদয়স্থল হিসেবে মাস কম বা বেশি হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৮৭, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৮, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৩২)

যেখানে ৬ মাস দিন/রাত থাকে সেখানে চাঁদ দেখার বিধান

যেখানে উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা ৬ মাস দিন/রাত থাকে সেখানে মাস নির্ধারণ করবে আশপাশের যেখানে চাঁদ দেখা যায় সেখানকার হিসেবে হিসাব করে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৯, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৪৯)

রমাযান মাস ৩০ দিন পুরা হওয়ার পরেও ঈদের চাঁদ দেখা না গেলে করণীয়

রমাযান মাস ৩০ দিন পুরা হয়ে গেছে, এখনো চাঁদ দেখা যায়নি। তাহলে ঈদের নামায আদায় করে ফেলবে; ৩১তম রোযা রাখবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৩৩)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষীর সংখ্যা

যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে রমাযানের জন্য একজন দীনদার মুসলমান পুরুষ বা মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ঈদের জন্য দুইজন দীনদার মুসলমান পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (তাফসীরে রাযী ৫/২৫৬, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮৫, ৩৮৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২১৭, মা-লা-বুদ্দা মিনহু; পৃষ্ঠা ৯৩)

অসুস্থ ব্যক্তির রোযার বিধান

হায়েয নেফাস-ওয়ালী মহিলার রোযার বিধান

হায়েয নেফাস-ওয়ালী মহিলার রোযা রাখা জায়েয নেই, তবে সুস্থ হলে ঐ রোযার কাযা আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৭১ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

মুস্তাহাযা মহিলার রোযার বিধান

মুস্তাহাযা (রোগের কারণে যোনিদ্বার দিয়ে রক্ত ঝরা) মহিলার রোযা রাখতে কোন সমস্যা নেই। (কিতাবুল মাবসুত ১/১৭৮ মাজমাউল আনহুর ১/৫৬ কিতাবুল মাসাইল ১/২৩১)

দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস বন্ধ হলে রোযা রাখার বিধান

যদি কোন মহিলা দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হয় তাহলে সে ঐ দিন রোযা রাখবে না। তবে রোযাদারদের মত খানা-পিনা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে ঐ দিনের রোযার কাযা আদায় করবে। (ফাতাওয়া

শামী ২/৪৪৮ আত্তাজরীদ ৩/১৫১৫ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৯)

দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা রাখার বিধান

দিনের বেলা হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা এমনিই ভেঙ্গে যাবে। তবে পরে ঐ রোযার কাযা আদায় করতে হবে। এমন মহিলার জন্য রোযাদারের সাদৃশ্য অবলম্বন করা জরুরী নয়। তবে সে রোযাদারের সামনে খানা-পিনা করবে না বরং আড়ালে গিয়ে খাবে। (আল জাওহারাতুন নায়্যিরা ১/১৪৪ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৭/২৬২)

রোযা অবস্থায় দিনের বেলা বমি হলে তার বিধান

রোযা অবস্থায় দিনের বেলা বমি হলে রোযা ভাঙ্গবে না, চাই বমি বেশি হোক অথবা কম হোক। (আল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা ১/৩৯৪, ফাতাওয়া শামী ২/৪১৪ কিতাবুল মাসাইল ২/১৬৬)

রোযা অবস্থায় বমি করার কারণে রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে যদি খানা খেয়ে ফেলে তাহলে ঐ রোযার বিধান

এই ব্যক্তির খানা খাওয়ার কারণে রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে। এ কারণে শুধু রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪১ মাজমাউল আনহুর ১/২৪৩ ইমদাদুল ফাতাওয়া জাদীদ ৪/২৬১)

রোযা রাখলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে রোযা রাখার বিধান

রোযা রাখলে যদি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে এখন রোযা না রেখে পরে শুধু কাযা করলেই হবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩৩৯ আল ইখতিয়ার ১/১৩৪ কিতাবুল মাসাইল ২/১৬৬)

বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির রোযার বিধান

বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি রোযা রাখবে না, বরং ফিদিয়া দিয়ে দিবে। (আল-বিনায়া শরহুল হিদায়া ৪/৮৩, কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

পাগলের রোযার বিধান

যদি পুরা রমাযান মাস পাগল থাকে তাহলে রোযার কাযা-কাফফারা কিছুই লাগবে না। আর যদি রমাযান মাসে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে পাগলামীর কারণে যতগুলো রোযা রাখতে পারেনি সবগুলোর কাযা আদায় করতে হবে। (বিনায়া শরহে হিদায়া ৪/৯৫ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

বেহুশ অবস্থায় রোযা রাখার বিধান

যে দিন বেহুশ হয়েছে ঐ দিন ছাড়া বাকি যত দিন বেহুশ ছিল ততদিনের রোযার কাযা আদায় করতে হবে। (বিনায়া শরহে হিদায়া ৪/৯৪ কিতাবুল মাসাইল ২/১৪৬)

রোযা অবস্থায় দাঁত ফেললে তার বিধান

দাঁত ফেলার কারণে রোযা ভাঙবে না। তবে যদি রক্ত মুখ থেকে গলার মধ্যে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৬ আন্নাহরুল ফায়িক্ব ২/১৮ কিতাবুল মাসাইল ২/১৫৫)

রোযা অবস্থায় কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে রোযার বিধান

রোযা অবস্থায় কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আল-মাবসূত ৩/৫৭ তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৩ কিতাবুল মাসাইল ২/১৫৫)

রোযা অবস্থায় নাক থেকে রক্ত বের হলে রোযার বিধান

নাক থেকে রক্ত বের হওয়ার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে না। তবে রক্ত যদি মুখ দিয়ে গলার মধ্যে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (মাজমাহুল আনহুর ১/৩৬১ কিতাবুল মাসাইল ২/১৬৩)

রোযা অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ

ঔষধের ঘ্রাণ গ্রহণের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ

রোযা অবস্থায় শুধুমাত্র ঔষধের ঘ্রাণ নেয়ার কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪১৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৭২)

গরম পানিতে ঔষধ ঢেলে ঔষধের ভাপ টেনে নেয়া

যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি গরম পানির সাথে ঔষধ মিশিয়ে তার ভাপ বা মেশিনের সাহায্যে ঔষধ মিশ্রিত ভাপ মুখ বা নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ এটাকে যদি বাতাসের পর্যায়েও ধরা হয় তাহলে ঔষধ মিশ্রিত হওয়ার দরুন তা ধোঁয়ার হুকুমে হবে, যা ইচ্ছাকৃত টেনে নিলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এছাড়া ভাপের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি থাকে, যার কারণে এটাকে জলীয় বাষ্প বলা হয়। তাই রোযা ভেঙ্গে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। (আল-মাবসূত ৩/৯৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, ফাতাওয়া শামী ২/৪০৩, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৮৭)

ইনহেলার (INHALER) ব্যবহার করা

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের ব্যপারে কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এর মাধ্যমে রোযা ভাঙ্গে না, তবে সতর্কতা হলো রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ এটা ব্যবহারের মাধ্যমে যদিও মনে হয় যে, শুধু বাতাস পেটে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হলো ঔষধের কিছু অংশও পেটে যায়, যদিও তা সামান্য। এর প্রমান হল, যদি ইনহিলার কোন কাঠ বা কাগজে স্প্রে করা হয় তাহলে ঐ অংশ ভিজে যায় এবং একটা আবরণ পড়ে, যার দ্বারা বুঝা যায়, এটা দেহবিশিষ্ট বস্তু, যা পেটে প্রবেশ করার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়। সুতরাং রোযা অবস্থায় বাধ্য হয়ে কেউ ইনহেলার ব্যবহার করলে পরবর্তীতে এ রোযা কাযা করে নিবে। আর আজীবন ইনহেলার ব্যবহারকারী হলে রোযার ফিদিয়া প্রদান করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪০৩, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬৬০, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৮৬)

অক্সিজেন মাস্ক (OXYZEN MASK) ব্যবহার করা

অক্সিজেন মাস্ক লাগানোর মাধ্যমে যদি বাতাস ছাড়া অন্য কিছু পেটে বা গলায় প্রবেশ না করে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ বাতাস দেহবিশিষ্ট বস্তু নয়, আর রোযা ভাঙ্গার জন্য দেহবিশিষ্ট কোন জিনিস শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা জরুরী। (ফাতাওয়া শামী ২/৪১৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৪৫, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৭৯)

নাকে ড্রপ বা ঔষধ ব্যবহার করা

রোযাদার ব্যক্তি যদি অসুস্থতার দরুন নাকে ড্রপ ব্যবহার করে আর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা টেনে নেয়ার মাধ্যমে কণ্ঠনালীর নিচে বা মস্তিষ্কে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৯, ফাতাওয়া শামী ২/৪০২, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৬৮)

চোখে ড্রপ ব্যবহার করা

রোযা রেখে চোখে ড্রপ ব্যবহার করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। যদিও ঔষধের তিক্ততা বা স্বাদ গলায় অনুভূত হয়। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৩, আল-বিনায়া ৪/৭১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৮৩)

কানে ড্রপ বা তেল ব্যবহার করা

কানে ড্রপ বা তেল ব্যবহার করার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও উলামায়ে কেরামের এ ফতোয়ার উপর আমল করার মধ্যেই অধিক সতর্কতা যে, এর দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে।

(আল-হিদায়া ১/১২৩, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৯, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৮৫)

মুখ গহ্বরে ঔষধ ব্যবহার

রোযা অবস্থায় শুধুমাত্র মুখের গহ্বরে ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয় না, যতক্ষণ না ঐ ঔষধ কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে। কেননা রোযা নষ্ট হওয়ার জন্য সরাসরি প্রবেশপথ তথা মুখ, নাক, পায়খানার রাস্তা ইত্যাদি দ্বারা কোন জিনিস পেটে প্রবেশ করা শর্ত। যেমন: লোমকূপ বা চামড়ার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কোন ঔষধ বা পানীয় প্রবেশ করার দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না। আর মুখের ভেতরের অংশ রোযার ক্ষেত্রে বাইরের অংশের হুকুমে, ফলে কুলি করা বা কোন জিনিসের স্বাদ অনুধাবনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, আল-হিদায়া ১/১২১, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৯৮)

নাইট্রোগ্লিসারিন (NITROGLYCERINE)

নাইট্রোগ্লিসারিন হচ্ছে হার্টের রোগীদের ঔষধ বিশেষ, যা জিহ্বার নিচে ২/৩ ফোঁটা ব্যবহার করে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। এতে ঐ ঔষধটি শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হচ্ছে, ঔষধ শুধুমাত্র শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মেশার দ্বারা রোযা নষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করার পর গিলে না ফেলা হয়। যদি না গিলে থুথুর সাহায্যে বাইরে ফেলে দেয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, আল-হিদায়া ১/১২১, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৯৮)

দাঁত উঠানো

দাঁত উঠানোর কারণে রোযার ক্ষতি হবে না। তবে রক্ত যদি ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক গলা দিয়ে ঢুকে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৪০, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৫৬৭, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯৪, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৮৪)

এন্ডোস্কপি (ENDOSCOPY)

একটি সরু পাইপ যার মাথায় বাল্ব লাগানো থাকে, গলা দিয়ে পেটে প্রবেশ করানো হয়। পাইপটির অপর প্রান্তে থাকা মনিটরের সাহায্যে পেটের আভ্যন্তরীণ রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করা হয়, একে এন্ডোস্কপি বলা হয়। এ পরীক্ষার শরয়ী বিধান হলো, যদি এর মাথায় কোন জেল লাগানো না থাকে তাহলে এর মাধ্যমে রোযা ভাঙ্গবে না। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৩০০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭)

মস্তিষ্কের অপারেশন

অপারেশন যদি মস্তিষ্কের এমন স্থানে হয় যেখান থেকে গলার কোন রাস্তা নেই তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। সাধারণত মস্তিষ্কের অপারেশন বলতে এটাকেই বুঝায়। তাই মস্তিষ্কের অপারেশনের কারণে রোযা ভাঙবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম দেমাগ তথা মস্তিষ্কে কিছু প্রবেশ করার কারণে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। কারণ হচ্ছে, আগে ধারণা করা হতো, মস্তিষ্ক থেকে গলা পর্যন্ত কোন রাস্তা বা ছিদ্রপথ আছে। আর এটা মনে করার কারণ সম্ভবত সর্দি লাগলে উপর থেকে শ্লেষ্মা বের হওয়া। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণামতে শ্লেষ্মার স্থান আর মস্তিষ্ক মূলত ভিন্ন। তাই মস্তিষ্কের অপারেশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত হলো রোযা ভাঙ্গবে না। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানী। (আল-ইনায়া ২/৩৪২, আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ ১/১৪১)

ইঞ্জেকশন (INJECTION), ইনসুলিন (INSULINE), বা টিকা নেয়া

রোযা অবস্থায় ইঞ্জেকশন, ইনসুলিন বা টিকা নেয়া যাবে, এ কারণে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। (সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৫৬৭, ফাতাওয়া শামী ২/৪১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৮০)

স্যালাইন নেয়া

রোযা অবস্থায় স্যালাইন নিলে রোযা ভাঙ্গে না। যদিও এর মাধ্যমে শারীরিক শক্তি লাভ হয়। (আল-হিদায়া ১/১২০, ফাতাওয়া ২/৩৯৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৮২)

রক্ত দান ও গ্রহণ

রক্ত দেয়া-নেয়া উভয়টিই রোযাদারের জন্য জায়েয। কেননা রক্ত দেয়া-নেয়ার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৪০, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৫৬৭, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, মাসাইলে রোযা; পৃষ্ঠা ১৩৭)

ডায়ালাইসিস করা (DIALYSIS)

ডায়ালাইসিস সাধারণত দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতি হলো, শরীরের সমস্ত রক্ত একটি নলের সাহায্যে মেশিন টেনে নেয় এবং আরেকটি নল দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণত এ পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে, শরীরের চামড়া কেটে তাতে থলে জাতীয় একটি জিনিস রেখে দেয়া হয় এবং থলেটি যে পাইপের মাথায় থাকে তার মুখ বাইরে থাকে। আর ঐ পাইপের মাধ্যমে থলের মধ্যে ঔষধ রেখে দেয়া হয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঐ কেমিক্যাল রক্তের বিষাক্ত পদার্থ নিজের মধ্যে টেনে নেয়। অতঃপর ১২ ঘণ্টা পর ঐ ঔষধ ফেলে দিয়ে নতুন ঔষধ দেয়া হয়। এ পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল হওয়ায় খুব কম প্রচলিত। ডায়ালাইসিসের এ উভয় পদ্ধতিতে যেহেতু রোযা ভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যায় না, কাজেই রোযাদার ব্যক্তির ডায়ালাইসিস করাতে কোন সমস্যা নেই। (বাদায়িউস সানায়ে ২/৯৩, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৪৯০)

এনজিওগ্রাম (ANGIOGRAM)

এনজিওগ্রাম হচ্ছে হার্টের বিশেষ পরীক্ষা। যখন কারো হার্টের রক্তনালী ব্লক হয়ে যায়, তখন উরুর গোড়ার দিকে কেটে একটি শিরার ভেতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে (যা হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে) পরীক্ষা করা হয়। এ ক্ষেত্রে নলের মাথায় কোন মেডিসিন লাগানো থাকলেও রোযার কোন সমস্যা হবে না, কারণ নলটি শরীরের কোন গ্রহণযোগ্য খালিস্থানে পৌঁছে না। (আল-হিদায়া ১/১২১, ফাতাওয়া শামী ২/২৯৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৩)

সাপোজিটরি (SUPPOSITORY) বা ডুস (DOUCHE) ব্যবহার করা

সাপোজিটরি বা ডুস ব্যবহারের কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭, তাবয়ীনুল হাকাইক ১/৩২৯, কিফায়াতুল মুফতী ৪/২৩৯)

অর্শ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বর্ধিত গোশত ভেতরে প্রবেশ করানো

অর্শ রোগী যদি বর্ধিত অংশ মলদ্বারের ভেতরে ঢুকানোর জন্য পানি, তেল, বা ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং উক্ত পানি, তেল বা ঔষধ ডুস-এর স্থান পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না, পৌঁছে গেলে ভেঙ্গে যাবে। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩২৯, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬৭৬, ফাতাওয়া কাসিমিয়া ১১/৫০২)

পুরুষের জন্য পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ব্যবহার করা

পুরুষের লজ্জাস্থানের ভেতর ঔষধ প্রবেশ করালে রোযা ভাঙ্গবে না। কারণ পেট ও মুত্রথলির মাঝে এমন কোন সরাসরি ছিদ্রপথ নেই যার মাধ্যমে ঔষধ পেটে প্রবেশের সুযোগ থাকে। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩৩০, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৮৩, আল-বিনায়া ৪/৬২)

মহিলাদের যোনিতে ঔষধ ব্যবহার করা
মহিলাদের রোযা রেখে লজ্জাস্থানে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত ছিল, রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাচীন ধারণামতে মুত্রথলি ও পেটের মাঝে সরাসরি রাস্তা আছে। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত হলো,এ দুইয়ের মাঝে সরাসরি কোন রাস্তা নেই। কারণ প্রশ্রাব মূলত মুত্রথলিতে পেট থেকে জমা হয় না বরং নিঃসৃত হয়। আর রোযা ভাঙ্গার জন্য শর্ত হলো গ্রহণযোগ্য কোন রাস্তা দিয়ে কিছু প্রবেশ করা। কাজেই মহিলাদের যোনিতে ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে না। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩৩০, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৮৩, আল-বিনায়া ৪/৬২)

ঔষধের মাধ্যমে মাসিক বন্ধ রেখে রোযা রাখা
যদি কোন মহিলা ঔষধের মাধ্যমে মাসিক বন্ধ রাখে তাহলে তাকে সুস্থ বলে গণ্য করা হবে এবং তাকে রোযা রাখতে হবে। তবে এমনটি করা অনুচিৎ, কারণ এতে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৭০)

সিস্টোস্কপি (CYSTOSCOPY)
সিস্টোস্কপি অর্থাৎ পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার লাগালে রোযা ভাঙবে না। কারণ এটা পাকস্থলী বা গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানে পৌঁছে না বরং এটা মুত্রথলিতে গিয়ে প্রশ্রাব বের হওয়া সহজ করে দেয়। আর মুত্রথলি রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য স্থান নয়। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৩৩০, আল-মুহীতুল বুরহানী ২/৩৮৩)

গর্ভপাত (Abortion) (ক) M.R (খ) D and C
Abortion গর্ভপাত দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে, বাচ্চার কোন অঙ্গ বা আকৃতি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে গর্ভপাত করা, যাকে Manstrual Regulation বা মাসিক নিয়মিতকরণ বলা হয়। এর সংক্ষিপ্ত রূপ M.R। গর্ভপাতের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে, বাচ্চার কোন আকৃতি প্রকাশ হওয়ার পর গর্ভপাত করা। একে Dialation And Curettage বলা হয়। এর সংক্ষিপ্ত রূপ D and C। উল্লিখিত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভপাতের দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে। প্রথম পদ্ধতিতে ভাঙ্গার কারণ হচ্ছে, যেহেতু বাচ্চার কোন অঙ্গ প্রকাশ পায়নি তাই ঐ গর্ভপাতের সময় বের হওয়া রক্ত হায়েয (ঋতুস্রাব) হিসেবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু বাচ্চার আকৃতি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই ঐ সময় বের হওয়া রক্ত নেফাস (গর্ভস্রাব) বিবেচিত হবে। আর হায়েয বা নেফাস উভয়টি শুরু হওয়ার মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে যায়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৭০)

কপার-টি (COPER-T)
কপার-টি হলো যোনিদ্বারে প্লাস্টিক স্থাপন করা, যাতে সহবাসের সময় বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ না করে। যোনিদ্বারে কেবল উক্ত প্লাস্টিক স্থাপন করার মাধ্যমে রোযা নষ্ট হয় না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা বা খালি জায়গা কোনটিই নয়। তবে রোযা রেখে এটা ব্যবহার করে সহবাস করলে রোযার কাযাও করতে হবে, কাফফারাও দিতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ে’ ২/৯৩, আল-বিনায়া ৪/৬৫, দুরারুল হুক্কাম ১/২০৩)

প্রক্টোস্কপি (PROCTOSCOPY)
প্রক্টোস্কপি অর্থাৎ অর্শ, পাইলস, ফিষ্টুলা ইত্যাদি রোগের পরীক্ষা। এর নিয়ম হচ্ছে, মলদ্বার দিয়ে একটি নল ঢুকানো হয় যাতে গ্লিসারিন জাতীয় পিচ্ছিল বস্তু ব্যবহার করা হয়। এটা নলের সাথে লেপ্টে থাকে। ফলে রোগীর কষ্ট কম হয়। যদিও ডাক্তারদের মতানুসারে ঐ পিচ্ছল বস্তুটি নলের সাথে লেগে থাকে এবং নলের সাথেই বেরিয়ে আসে ভিতরে থেকে যায় না, আর থাকলেও পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে, তবুও ঐ বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং কিছু সময় ভেতরে অবস্থানের কারণে রোযা ভেঙ্গে যাবে। ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭, তাবয়ীনুল হাকায়িক ১/৮)

ল্যাপারস্কপি বায়োপসি (LAPAROS-COPY-BIOPSY)
মেশিনের সাহায্যে পেট ছিদ্র করে ভেতরের কোন অংশ বা গোস্ত পরীক্ষার জন্য বের করে আনার নাম ল্যাপারস্কপি। এ পরীক্ষার মাধ্যমে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যদি মেশিনের মাথায় কোন ঔষধ লাগানো থাকে আর তা পাকস্থলীতে রয়ে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৩০০, ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৭)

সিরোদকার অপারেশন (SHIRODKAR OPERATION)
সিরোকদার অপারেশন হচ্ছে, অকাল গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুর্দিকে সেলাই করে মুখকে খিঁচিয়ে রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। আর এর মাধ্যমে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। (বাদায়িউস সানায়ে’ ২/৯৩, আল-বিনায়া ৪/৬৫, দুরারুল হুক্কাম ১/২০৩)

রোযা ভেঙ্গে যাওয়া ও কাযার বিধান

রোযা অবস্থায় আগরবাতি বা কোন সুগন্ধি জাতীয় জিনিস জ্বালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নাক বা মুখ দিয়ে তার ধোঁয়া টেনে নিলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এই রোযার কাযা করা ওয়াজিব। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৬, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১০৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৭০)

রোযা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে সামান্য পানি অনিচ্ছাকৃত পেটে চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া শামী ২/৪০১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬৬)

রোযা অবস্থায় ঢেঁকুর আসলে পেট থেকে কিছু খাবার মুখে বা কণ্ঠনালীতে চলে আসে। এই খাবার ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৬৬, ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ৪৪৭)

রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করলে দাঁত থেকে বের হওয়া রক্ত যদি থুথু সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয়, এটা গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬৫, ৪০৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৮)

রোযা অবস্থায় মশা-মাছি অনিচ্ছাকৃত পেটে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৩, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৭)

রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে বা অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভাঙবে না। তবে ইচ্ছাকৃত বমি করলে এবং সেটা মুখ ভরা পরিমাণ হলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা করা ওয়াজিব হয়। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৩৮০, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৭২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৮৮)

রমাযানের কাফ্ফারার মাসাইল

রমাযানের কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি

রমাযানের কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়ার মূলনীতি দু'টি–

এক. শরয়ী কোন ওযর ব্যতীত রমাযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য বা খাদ্যজাতীয় কোন কিছু গ্রহণ করা।

দুই. সহবাসের মাধ্যমে মনের খাহেশাত পূর্ণ করা। সুতরাং যদি কেউ রমাযানের রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানা-পিনা করে কিংবা সহবাস করে তাহলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী; হা.নং ৮০৫৪, কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ ১/৫০৯, ফাতাওয়া শামী ২/৪১০, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪০১)

রোযার কাফ্ফারা

রোযার কাফ্ফারা হলো, লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা যার মাঝে রমাযান, ঈদ ও আইয়্যামে তাশরীক (ঈদুল আযহার পরবর্তী ৩ দিন) না হতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো বা ৬০টি সদকায়ে ফিতর আদায় করা। (সূরা মুজাদালাহ- ৩-৪, সুনানে দারাকুতনী; হা.নং ২৩০৬, ফাতাওয়া শামী ২/৪১২, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪০২)

একটি কাফ্ফারা কয়েকজনকে কিংবা কয়েকটি কাফ্ফারা একজনকে দেয়ার বিধান

একই কাফ্ফারা কয়েকজনকে দেয়া যাবে। অনুরূপভাবে একাধিক কাফ্ফারাও একজনকে দেয়া যাবে। তবে একজনকে একদিনে একাধিক কাফ্ফারা দিলে একদিনেরটাই আদায় হবে। অতিরিক্তটুকু নফল হিসেবে গণ্য হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫৬৭, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৭৮, আলবাহরুর রায়িক ৪/১১৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪০২)

কাফ্ফারার রোযা আদায়কালে হায়েয, নেফাস অথবা অন্য কোন কারণে রোযা ভঙ্গ করার বিধান

কাফ্ফারার রোযা লাগাতার দুই মাস রাখা আবশ্যক। হায়েয ব্যতীত অন্য কোন কারণে যদি একটি রোযাও ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে পুনরায় লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫১২, ফাতাওয়া শামী ৩/৪৭৬, ২/৪১২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪৫৫)

কাফ্ফারার রোযার নিয়ত কখন করবে?

কাফ্ফারার রোযার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বেই করতে হবে। পরে নিয়ত করলে রোযাটি কাফ্ফারা হিসেবে আদায় হবে না। (কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ ১/৪৯৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৫৮, ফাতাওয়া শামী ২/৩৮০)

ই'তিকাফের মাসাইল

ই'তিকাফের পরিচয় ও প্রকারভেদ

ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকেক ই'তিকাফ বলে। ই'তিকাফ তিন প্রকার– ১. মান্নতের কারণে ওয়াজিব ই'তিকাফ। ২. রমাযানের শেষ দশ দিনের সুন্নাত ই'তিকাফ। ৩. নফল ই'তিকাফ, যার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৮৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২৫)

জামা'আত হয় না এমন মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান

ইমাম মুয়াযযিন নির্ধারিত আছে এমন মসজিদে ই'তিকাফ সহীহ হবে, যদিও তাতে নিয়মিত জামা'আত না হয়। এমনটি হলে ই'তিকাফকারী ই'তিকাফ অবস্থায় কমপক্ষে একজনকে সাথে নিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৭)

এক মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকাবস্থায় শুধুমাত্র এক মসজিদে ই'তিকাফ করার বিধান

ই'তিকাফ হলো মহল্লাভিত্তিক ইবাদত। সুতরাং এক মহল্লায় একাধিক মসজিদ থাকলে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায় করার দ্বারা পুরো মহল্লাবাসীর ই'তিকাফ আদায় হয়ে যাবে। তবে সম্ভব হলে সব মসজিদেই ই'তিকাফ করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৫, মাজমাউল আনহুর ১/৩৭৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫০৮)

মসজিদ থেকে ভুলে বের হয়ে গেলে ই'তিকাফের হুকুম

মসজিদ থেকে ভুলে বের হলেও ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/৫০৭)

মসজিদের বারান্দার হুকুম

মসজিদের সীমানা নির্ধারণ করার সময় যদি বারান্দা মসজিদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তাহলে তা মসজিদের হুকুমে হবে, নতুবা মসজিদের হুকুমে ধরা হবে না। কজেই মসজিদ কমিটি মসজিদের শুরু কোত্থেকে তা ঘোষণা করে দিবে, বা দেয়ালে লিখে দিবে। (ফাতাওয়া শামী ৪/৩৫৮, ফাতাওয়া উসমানী ২/৫১১, ফাতাওয়া দারল উলূম দেওবন্দ ৬/৫০৭)

অসুস্থতার কারণে রমাযানের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ ভঙ্গ করার হুকুম

উল্লিখিত অবস্থায় নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী যে দিন ই'তিকাফ ভঙ্গ করেছে শুধুমাত্র সেদিনের ই'তিকাফ রোযাসহ কাযা আদায় করবে। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৪৬, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৯৫, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/১৩০)

নফল উযূ বা জুমু'আর মুস্তাহাব গোসলের জন্য বের হওয়ার বিধান

নফল উযূ বা জুমু'আর মুস্তাহাব গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। (আল-ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার ১/২২০, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৯৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৭)

বায়ু ত্যাগ করার জন্য মসজিদের বাইরে যাওয়ার বিধান

নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী বায়ু ত্যাগ করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয আছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৬৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৭১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৫)

খাওয়ার জন্য ই'তিকাফকারীর বাড়িতে যাওয়ার বিধান

যদি খানা আনার মত অন্য কোন লোক পাওয়া না যায়, তাহলে ই'তিকাফকারী খাওয়ার জন্য বাড়িতে যেতে পারবে। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৩২৬, ৫২৭, বাদায়িউস সানায়ে' ২/২৮৩, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭০৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৩১৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬২৪)

মহিলাদের ই'তিকাফের বিধান

মহিলাদের জন্য ঘরে ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। মহিলাদের ই'তিকাফের পদ্ধতি হলো, তারা বাসার নামাযঘরে বা কোন কামরাকে আপাতত নামাযঘর নির্ধারণ করে সে স্থানকে ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে নিবে এবং সেখান থেকে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৪৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২১১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৬২৯)

ভারতে তাবলীগের বর্তমান হালত

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে পাঁচজনের একটি কাফেলা ভারত সফরে গিয়েছিল। কাফেলায় দু'জন আলেম দীন ছিলেন। একজন হচ্ছেন, মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসেমী। অপরজন গাজীপুর মারকাযের সম্মানিত ইমাম ও খতীব। বাকি তিনজন তাবলীগের পুরনো সাথী। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তারা ভারতের বর্তমান তাবলীগী কার্যক্রমের যে হালত পেশ করেছেন, তা পাঠকের খিদমতে পেশ করা হলো।

ভারতে তাবলীগের বর্তমান অবস্থা কিছু অনুভূতি

মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসেমী

মাওলানা সাদ সাহেবের চরম বিতর্কিত বয়ানসমূহকে কেন্দ্র করে তাবলীগের মাঝে ভাঙন দেখা দেয়। ভারত, বাংলাদেশসহ গোটা পৃথিবীতেই এর প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের অবস্থা তো আমাদের সামনে। পাকিস্তানের পরিবেশ অনেক স্থিতিশীল। ভারতে যেহেতু তাবলীগের বিশ্ব মারকায, তাই ওখানের পরিস্থিতি জানতে অনেকেই মুখিয়ে আছেন। আমি নিজেও বিষয়টার প্রতি আগ্রহী ও যত্নশীল।

গত ৮/৯ দিনের ভারত সফরের সময় কোলকাতা, দিল্লী, দেওবন্দ, সাহারানপুর ও বোম্বে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্নজনের কাছ থেকে বিভিন্ন মন্তব্য ও বিশ্লেষণ শুনেছি।

১. ভারতে সাদপন্থীরা গণ্ডগোলের শুরুর দিকে বেশ শক্তিশালী ছিল। শুরায়ী নেযাম বা আলমী শুরাপন্থীদের শক্তি ও জনবল ছিল একেবারে কম। তার কারণ হল, সাদপন্থীগণ জনসাধারণকে বুঝাত যে, তাবলীগের এই ঝামেলা নেতৃত্বকেন্দ্রিক। অর্থাৎ আহমাদ লাট সাহেব, ইবরাহীম দেওলা সাহেবরা নেতা হতে চায়, অথচ তাবলীগের আমীর তো মাওলানা সাদ সাহেব! তারা এসব মিথ্যা কথা প্রচার করত। কিন্তু বিষয়টি যে কেবল নেতৃত্বের নয় বরং আকীদা-বিশ্বাসের, সেটি বুঝতে দেয়া হতো না। এখন আস্তে আস্তে জনগণ বিষয়টি বুঝতে শুরু করেছে ।

সাদ সাহেব তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর এবং দীর্ঘদিন যাবত বিশ্বের নানা প্রান্তের ইজতেমাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাকে বয়ান দেয়া হতো, তাবলীগ পরিচালনায় লাট সাহেব, দেওলা সাহেব এমনকি মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের তুলনায় সাদ সাহেবকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। এ কারণে সাদ সাহেবের ভক্তবৃন্দ অনেক বেশী। এমন জনপ্রিয় লোকের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে কিছু বললে বিশ্বাস করা মুশকিল। তাই তার মুখোশ খুলতে দেরী হয়েছে।

২. বিভিন্ন কারণে ভারতে বাংলাদেশের মতো ওয়াযাহাত করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের আলেমগণ যেভাবে সাদ সাহেবের বিপক্ষে মাঠে নেমেছেন, সেখানে তেমনটা করা হয়নি। এর অবশ্য অনেক কারণ থাকতে পারে। একটি হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মুসলমানদের বিবাদ সামনে না আনাই মঙ্গলজনক। তাছাড়া মোদি সরকার সাহেবের পক্ষে। শোনা যায়, মোদির সাথে নাকি সাদ সাহেবের ব্যবসা রয়েছে।

ভারত একটি বিশাল রাষ্ট্র। একেক এলাকার একেক ভাষা। কেরালা, মাদ্রাজ প্রভৃতি এলাকার লোকজন উর্দু/হিন্দি বুঝে না। যে কারণে সাদ সাহেবের গোমরাহীগুলো তাদের বুঝতে দেরী হয়। আর ওখানে সবাইকে নিয়ে একত্রে ওয়াযাহাতি সমাবেশ করাও মুশকিল।

৩. বর্তমানে ভারতে সাদ সাহেবের পক্ষের লোক শতকরা ৩০% হতে পারে। কেউ কেউ আরও বেশি, কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে আলেমদের ৯০%ই সাদ সাহেবের বিপক্ষে। ভূপালে একসময় সাদ সাহেবের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল, এখন তা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে পূর্ব ইউপির কিছু এলাকায় সাদ সাহেবের লোকজন বেশি। এছাড়া সব জায়গাতেই তার লোকজন কমছে। গত রোববার বোম্বের রাহমানিয়া মাদরাসায় শুরায়ী নেযামের জোড় অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়েছে।

৪. নদওয়ার মাওলানা সালমান নদভী ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো আলেম সাদ সাহেবের পক্ষাবলম্বন করেনি। সালমান সাহেবও সরাসরি সাদ সাহেবের মতবাদ বিশ্বাস করে, এমন কথা আমি শুনিনি। দেওবন্দ, সাহারানপুর, নদওয়া, আক্কেলকুয়াসহ ভারতের বড় বড় সব প্রতিষ্ঠান সাদ সাহেবের বিরোধী, সবাই শুরায়ী নেযামের পক্ষে। আলহামদুলিল্লাহ।

৫. ভারতে এবং বাংলাদেশেও, একসময় যারা সাদ সাহেবের ভুল ধরতো, সবার আগে তারাই সাদ সাহেবের বয়ানের ভুলগুলো ধরছিল, এখন তারা সাদ সাহেবের পক্ষে! এমন কয়েকজনের নাম মুরুব্বীরা আমাদেরকে বলেছেন। স্বার্থের কারণেই এমনটা হচ্ছে!

৬. দারুল উলুম দেওবন্দের ক্যাম্পাসের ভেতরে সাদ সাহেবের পক্ষের ছাত্র এবং শুরায়ী নেযামের ছাত্রদের মাঝে তর্কবিতর্ক হয়, হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়; তাই কতৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ক্যাম্পাসের ভেতর তাবলীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নইলে মাদরাসার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

৭. জনসাধারণ তো বটেই, অনেক পাকা তাবলীগী সাথীও এসব ঝামেলার মূল কারণ জানে না। তাবলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় তারা সীমাহীন কষ্ট পেয়েছে। তারা কাজ করতে চায়, সবাইকে মিলেমিশে থাকতে দেখতে পছন্দ করে। সম্ভব হলে মূল কারণগুলো তাদের সামনে স্পষ্ট করা।

৮. তাবলীগের আমীর না হলেও মূল বা প্রধান কিংবা পুরোধা ব্যক্তিত্ব সাদ সাহেবের ভুল ও ভ্রান্তিমূলক বয়ানগুলো প্রমাণ করে, যে কোনো মানুষ দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব (নবী-রাসূলদের কথা ভিন্ন, সাহাবায়ে কেরামও মাহফুজ ছিলেন)। তাই সাদ সাহেবের নেতৃত্বের কারণেই

হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক তাবলীগের মাঝে অনেক কুসংস্কার, ভ্রান্তি, তাহরীফ ইত্যাদি প্রবেশ করেছে। এগুলোরও সংস্কার হওয়া দরকার।

৯. দীনের প্রতিটি কাজেই আলেমদের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে ভুলের অনুপ্রবেশ অনেক সহজ। সুতরাং আলেমদের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন তাবলীগওয়ালাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

১০. বোম্বের মারকাযের একজন মুরুব্বীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাবলীগের কাজে টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়, মারকাযগুলো চালাতেও টাকা-পয়সার দরকার পড়ে। আর এসব টাকা-পয়সার দাতা জনসাধারণ। তো এগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা জরুরী কিনা? বললেন, হ্যাঁ, জরুরী। বললাম, তাহলে আপনারা রাখেন না কেন? তিনি বললেন, আমাদের এখানে রাখা হয়।

মাদরাসাগুলোর যেমন আয়-ব্যয়ের হিসাব হয়, রসিদ হয়, অডিট হয়; মারকাযগুলোও এমন হওয়া জরুরী। অর্থাৎ আয়েরও হিসাব থাকবে, ব্যয়েরও হিসাব থাকবে। সবকিছুই নিয়মতান্ত্রিক হবে।

১১. কোলকাতা, দিল্লী ও বোম্বের মারকাযগুলোতে দেখলাম ইমাম সাহেব মাইক দিয়ে নামায পড়াচ্ছেন, কিরাআতও মাইকেই পড়ছেন। আমাদের মারকায ও ইজতেমাগুলোতেও মাইকের ব্যবহার করলে ভালো হয় না?

১২. সব কাজেই যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। সফল নেতৃত্ব ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়। তাবলীগের পরবর্তী নেতৃত্বে কারা আসবে, কাদেরকে প্রস্তুত করা হচ্ছে? এমন প্রশ্নের কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। নেতৃত্বের বিষয় না ভাবলে সাদ সাহেবের মতো গোমরাহ লোক নেতৃত্বে বসে যাবে; যাকে হটানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

১৩. সাদ সাহেব আইন করেছিলেন, কোনো মারকাযে নতুন করে মাদরাসা বানানো যাবে না। এই আইনের উদ্দেশ্য এখন পরিষ্কার। তাই ভারতের মারকাযগুলোতে মাদরাসা নির্মিত হচ্ছে/হবে। বোম্বে মারকাযেও মাদরাসা আছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মারকাযে বা মারকাযের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার হিম্মত দেখাতে পারেবন কি? নাকি আগের যুগেই থাকবেন? কতো বড় জাহালাত! এমন জাহালতি বুদ্ধি বের হয়েছে কোন শয়তানের মাথা থেকে, তাও আমরা বুঝতে পারিনি। তা'লীম ছাড়া তাবলীগের কী মূল্যায়ন আছে?!

ভর্তি চলছে

ইসলামী তাহ্যীব পুনরুদ্ধারে এক বিনম্র প্রয়াস

তাহ্যীবুন নিসা বালিকা মাদ্রাসা ঢাকা

আবাসিক/অনাবাসিক আরবী, বাংলা ও ইংরেজীর সমন্বয়ে গঠিত বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া কর্তৃক মনোনীত সিলেবাস

আমাদের বর্তমান বিভাগ সমূহ্

- মক্তব — ২ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন নাযেরাসহ শিশু ও ১ম শ্রেণির বাংলা, গণিত ও ইংরেজী সম্পন্ন
- হিফ্য — মানসম্মত আধুনিক হিফ্য বিভাগ
- নিয়মিত শ্রেণিসমূহ — রওযাতুল আত্বফাল (শিশু শ্রেণি) হতে নাহবেমীর (৭ম শ্রেণি) পর্যন্ত।
- খুসূসী জামা'আত — বিশুদ্ধ নাযেরা এবং স্কুলে কমপক্ষে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত যারা পড়েছে, তাদের জন্য-বিশেষ জামা'আত।
- জরুরী দ্বীনিয়্যাত — বয়স্কা মহিলাদের জন্য জরুরী দ্বীনিয়্যাত ও কুরআন শিক্ষামূলক কোর্স।

আমাদের বৈশিষ্ট্যাবলী

১) শিক্ষিকাদের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও ছাত্রীদের ঘরোয়া মনোরম পরিবেশে শিক্ষা প্রদান।
২) ইলমের সাথে আমলের সমন্বয়ের ব্যাপক পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা।
৩) নারী সমাজে দ্বীনি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে দা'ওয়াতের চেতনা তৈরি।
৪) দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, গণিত, ইংরেজী, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা।
৫) তিন বেলা রুটিনমাফিক রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন।

নূরানী ক্বারিয়ানা ট্রেনিং — ১-২৪শে রমাযান পর্যন্ত হারদূঈ'র নিয়মে সবধরণের মহিলাদের জন্য কুরআন শিক্ষার বিশেষ কোর্স।

২২, এভিনিও (৪০ফুট মেইন রোড), ফিউচার টাউন, মোঃপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ঃ ০১৯২৪০৮৫৬৭৮, ০১৭১২৮৭৯৫২৪
যাতায়াত ঃ মোঃপুর বেড়ীবাঁধ তিন রাস্তার মোড় হতে রিক্সা/অটোরিক্সায় গার্ডেন সিটি হাউজিং অফিসের পার্শ্বে

মা'আস্ সালাম
মাও. মুফতী সাইফুর রহমান
পরিচালক

স্বাধীনতা দিবসে মোমবাতির মাতামাতি কিছু বিনীত প্রশ্ন

মাওলানা হাফিজুর রহমান

স্বাধীনতার সাথে মোমবাতির সম্পর্ক কী? এ দিনে মোমবাতি জ্বালালে কী হয়? এটা কাদের কালচার? কেন এ কালচারের সূচনা হয়েছিলো? যারা এর আয়োজন করেন কিংবা এ কালচারের প্রবক্তা তাদের কেউ অনুগ্রহপূর্বক প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

কোথা থেকে এলো এ মোমবাতি কালচার?

যতটুকু জানতে পেরেছি প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে মোমবাতি কালচারের সূচনা হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিলো, মৃত মানুষের আত্মা আলো হয়ে পৃথিবীতে থেকে যায়। তাই তারা মোমের আলো জ্বেলে তাদের মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক উপাসনা পালন করতো, যাতে তারা মরে গিয়েও প্রিয়জনদের কাছে আলো হয়ে বেঁচে থাকে অনন্তকাল। জন্মদিনে কেকের উপর মোমবাতি জ্বালাবার ধারণাটাও এখান থেকে গৃহীত। জন্মদিনে কেকের উপর মোমবাতি জ্বেলে আবার নিভিয়ে ফেলা হয়। কারণ জীবিত ব্যক্তিদের এখনো আলো হবার সময় হয়নি। ধর্মীয় গ্রীক কালচার থেকে অমুসলিম সম্প্রদায় এ কালচারকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এটা মুসলমানদের কালচার কোনো কালে ছিলো না; এখনো নেই।

মোমবাতি থেকে মঙ্গলপ্রদীপ

মৃত ব্যক্তিদের স্মরণে এখন মোমবাতির নতুন ভার্সন শুরু হতে চলেছে মঙ্গলপ্রদীপ। মঙ্গলপ্রদীপ এটি হিন্দুধর্মীয় পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ পূজার জন্য যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয় তাকে বলা হয় মঙ্গলপ্রদীপ। পূজার সময় মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটানো হয় তাকে বলা হয় মঙ্গল আরতি। ২০১৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় এক লক্ষ মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে ভাষা-শহীদদের স্মরণ করা হয়েছে। মুসলিমদের চিন্তা বিশ্বাসে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হতে বোধহয় আর বেশি বাকি নেই।

মোমবাতি কিংবা মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালালে মৃতব্যক্তিগণ কি প্রীত হন?

নশ্বর এ পৃথিবী মূলত উপার্জনস্থল। এ জগতে যে যত বেশি পুণ্য উপার্জন করে যেতে পারবে পরজগতে সে তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। পক্ষান্তরে যার পুণ্য উপার্জন যত কম হবে তার দুরবস্থার পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাবে। প্রশ্ন হল, মোমবাতি কিংবা মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালালে কি সে দুরবস্থা দূরীভূত হবে? একজন মানুষ যখন পৃথিবী থেকে চলে যায় তখন তার যাবতীয় উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম, হা.নং ৬৯৯৫) সে বড়ো অসহায়, নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তখন সে একটুখানি পুণ্য লাভের আশায় ছটফট করতে থাকে। যেভাবে অথৈ সাগরে নিমজ্জমান জাহাযের যাত্রীকুল বাঁচার আশায় আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির একমাত্র ক্ষুধা পুণ্য লাভের ক্ষুধা। তার চাওয়া-পাওয়ার শেষ অবলম্বন জীবিতদের প্রেরিত সওয়াব-প্রতিদান। এ জগতের বস্তুগত ভোগ-বিলাস ও মান-সম্মান সে আদৌ কামনা করে না। এ-ই যদি হয় একজন পরকালবাসীর চাওয়া-পাওয়ার রূপরেখা তাহলে তার নির্জীব মরদেহকে উপলক্ষ করে মোমবাতি কিংবা মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটানো কি তার সাথে উপহাস নয়? যারা ধরা-বাঁধা নির্দিষ্ট কিছু দিবসে মোমবাতি কিংবা প্রদীপ সংস্কৃতিতে বিভোর থাকেন তারা কি নিশ্চয় করে বলতে পারবেন এতে কবরস্থ নিঃসঙ্গ ব্যক্তিটির মঙ্গল বা কল্যাণ হয় এবং এতে তার আত্মা তৃপ্তি বোধ করে? তাহলে এত আলোক আয়োজনের স্বার্থকতা কী? অসহায় নিঃস্ব মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আপন স্বার্থ উদ্ধারই কি এ আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য? এটা কি 'ঘর পুড়িয়ে আলু পোড়ানো' নয়? এ সংস্কৃতিতে যদি শ্রদ্ধা নিবেদন উদ্দেশ্য হয় তবে সে মৃত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধান্বিত হন? না কি অপমানিত? যার যে অধিকার প্রাপ্য, যিনি যে মর্যাদার প্রাপক তাকে সে অধিকার ও মর্যাদা না দিয়ে অকার্যকর কিছু দিয়ে তার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করা হলে কি তার মানহানি হয় না? তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার সাথে উপহাস করা হয় না? বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হলে আশা করি এর নির্মোহ ও পরিচ্ছন্ন উত্তর বেরিয়ে আসবে।

মোমবাতি কালচারের সাথে ধর্মীয় সম্পৃক্তি আছে কি নেই?

ভাষা শহীদ কিংবা স্বাধীনতা শহীদদের নামে আয়োজিত এই প্রদীপ কালচারের সাথে ইসলামের ইতিবাচক কোনো সম্পৃক্তি নেই। তবে নেতিবাচক সম্পৃক্তি আছে। ইসলাম এমন একটি সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী আদর্শ যা সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের একচেটিয়া অধিকার রাখে। স্বাধীনতা দিবস কিংবা ভাষা দিবস এবং তা পালনের গতি-পথ, নৈতিকতা-অনৈতিকতা এবং বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে কথা বলতে ইসলাম বাধ্য। সুতরাং ইসলাম ভাষাশহীদ কিংবা স্বাধীনতা-শহীদদের নামে আয়োজিত এসব প্রদীপ কালচার বিশ্লেষণ করে নীতিনির্ধারণী-মূলক কথা বলবে এবং তাকে বলতেই হবে। এটা ইসলাম ও ইসলামের ধারক-বাহকদের নৈতিক দায়বদ্ধতা। পালিত দিবসগুলোতে নারী পুরুষের অবাধ চলাচল হয়। এ বিষয়ে কি ইসলামের বিধিনিষেধ নেই? পর্দাবিধান চরমভাবে লজ্ঘিত হয়। এ ব্যাপারটিতে কি ইসলামে কোনো কথা বলার নেই? চরম আপত্তিকর পোশাকের প্রদর্শনী হয়। এ ব্যাপারে কি ইসলাম কথা বলবে না? ভিন্ন ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ধর্মীয় সংস্কৃতি লালন করা হয়। এ ব্যাপারে কি ইসলাম কিছুই বলবে না? তবে এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই– এ কথা বলার মানে কী?

লেখক : শিক্ষাসচিব, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসান
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

৩২৬ প্রশ্ন : (ক) গোসল ফরয হয়েছে এমন মহিলা যদি গোসলের সময় (ঠাণ্ডা ইত্যাদির কারণে) এজন্য মাথায় পানি না দিতে পারে যে, মাথায় পানি দিলে চুল ভিজে থাকায় মাথাব্যথা সৃষ্টি হয়, তবে সে কি তায়াম্মুম করবে, না মাথা বাদ দিয়ে সারা শরীর ধুয়ে নিবে?

(খ) মাথা ধৌত করলে মাথাব্যথার সৃষ্টি হবে এ আশঙ্কা যখন দূর হয়ে যাবে, তখন কি তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে বা মাথা আবার ধৌত করতে হবে, না এ অবস্থায়ই গোসল না করে নামায আদায় করতে পারবে?

(গ) যদি তায়াম্মুম করা সহীহ না হয়ে থাকে, তাহলে এতদিন তায়াম্মুম করে যে নামাযগুলো আদায় করা হয়েছে সেগুলোর বিধান কী?

উত্তর : (ক) গোসলের সময় মাথা ধৌত করলে যদি প্রচণ্ড মাথাব্যথা কিংবা অন্য কোন অসুস্থতার প্রবল আশঙ্কা হয়, তাহলে এমন মহিলা তায়াম্মুম করবে না; বরং মাথা বাদ দিয়ে সারা শরীর ধৌত করবে এবং হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করে নিবে। এতেই তার গোসল আদায় হয়ে যাবে। তবে অসুস্থতার প্রবল ধারণা না হলে নিছক সংশয়ের কারণে এমনটি করা বৈধ হবে না। আর যদি মাথা মাসাহ করলেও অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে মাথা ধৌত করা বা মাসাহ করা, কোনটিই আবশ্যক নয়। মাথা বাদ দিয়ে বাকি শরীর ধৌত করে নিলেই গোসল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, যদি গরম পানির সুব্যবস্থা থাকে অথবা গোসলের পর তাৎক্ষণিক মাথা শুকানোর সুব্যবস্থা থাকে এবং গরম পানি দ্বারা মাথা ধুলে কিংবা মাথা শুকানোর উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অসুস্থতার প্রবল আশঙ্কা দূর হয়ে যায়, তাহলে উক্ত মহিলার জন্য মাথা ধৌত না করে কেবল শরীর ধৌত করলে গোসল সহীহ হবে না; রবং তার জন্য মাথা ধৌত করে গোসল করা জরুরী হবে।

(খ) যখন উক্ত মহিলা মাথা ধৌত করতে সক্ষম হবে, তখন শুধু মাথা ধৌত করতে হবে; পুনরায় গোসল করতে হবে না। এমতাবস্থায় মাথা ধৌত না করে নামায আদায় করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অপারগতার দরুণ তায়াম্মুম করবে, যখন তার অপারগতা দূর হয়ে যাবে, তখন তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে।

(গ) প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে মাসআলা সেটাই যা উপরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করবে না। বরং সারা শরীর ধৌত করে মাথা মাসাহ করে নিবে। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে পড়া নামাযগুলো পুনরায় কাযা করতে হবে। সাথে সাথে তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।

উল্লেখ্য, মাসআলা না জেনে এভাবে নিজের বুঝ অনুযায়ী আমল করা মারাত্মক ভুল হয়েছে। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৮১, ফাতাওয়া শামী ১/১৫৩, ১৬০, ২৫৬, বেহেশতী যেওর ১/৭২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/১৫৮)

আবূ আব্দুল্লাহ

৩২৭ প্রশ্ন : (ক) আমার জানামতে যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় সেই যাকাত খেতে পারবে। আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগনী, ভাতিজী, স্ত্রীর ছোট বোন যাদের নিকট কিছু স্বর্ণালঙ্কার থাকলেও নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিয়ের সময় বিয়ের খরচ বাবদ যাকাতের কিছু টাকা তাদেরকে না জানিয়ে তাদের হাতে দিয়ে মালিক বানিয়ে দেই, তাহলে কি যাকাত আদায় হবে?

(খ) এক মেয়ের বিয়ের সময় মহর নির্ধারণ করা হয় দুই লাখ টাকা, যা স্বামী পরিশোধ করেনি। সেই মহর সাধারণত বাকী মহর হিসেবে থাকে যা স্ত্রী চায় না এবং স্বামীও পরিশোধ করে দেয় না। এমতাবস্থায় প্রয়োজনে যদি উক্ত মেয়েকে যাকাতের টাকা দেয়া হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে কী?

উত্তর : (ক) শরীয়তের বিধানমতে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কেবল ঐ সকল লোকই হয়, যাদের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ঋণমুক্ত সম্পদ (চাই আসবাবপত্র হোক কিংবা জায়গা সম্পত্তি বা অন্য যে কোন সামগ্রী) নিসাব পরিমাণ তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ (যা বর্তমানে প্রায় ৪০, ০০০/- টাকা) না থাকে। আর যাকাতের টাকা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে পিতা-মাতা কর্তৃক নিজ সন্তানাদি ও সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতা এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রী ও স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দেয়া ব্যতীত অন্য সকলকেই দেয়া যায়। বরং সকল কল্যাণকর কাজে আত্মীয়-স্বজনকে প্রাধান্য দেয়াই অধিক সওয়াবের কাজ।

প্রশ্নে বর্ণিত আপনার ভাগনী, ভাতিজী ও স্ত্রীর ছোট বোনের নিকট যে অলঙ্কার আছে তা যদি নেসাব পরিমাণ (অর্থাৎ শুধু স্বর্ণ হলে সাড়ে সাত ভরি এবং শুধু রৌপ্য হলে সাড়ে বায়ান্ন ভরি) না হয় এবং নিত্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য কোন সম্পদ, অলঙ্কারসহ যার সামষ্টিক মূল্য ৪০,০০০/- টাকা বা তার বেশি না হয়, তাহলে তাদেরকে না জানিয়ে তাদের বিয়ের সময় বিয়ের খরচ বাবদ যাকাতের কিছু টাকা দিয়ে মালিক বানিয়ে দিলে আপনার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে অধিক সওয়াবের অধিকারীও হবেন। (সূরা বাকারা- ৪৩, সূরা তাওবা- ৬০, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২৫৮২, বাদায়িউস সানায়ে’ ২/৪৫৮, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪১৯, ৪২৫, ফাতাওয়া কাযীখান ১/২৩৫, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৬, ৩৫৬, কিতাবুন নাওয়াযিল ৭/৭০)

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত মেয়ের মহর যদি নগদ পরিশোধযোগ্য না হয়; বরং বাকি হয় বা নগদ হলেও স্বামী এ মুহূর্তে পরিশোধ করতে প্রস্তুত নয় এবং এছাড়া তার নিকট নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ঋণমুক্ত সম্পদও নিসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে উক্ত মেয়েকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৩৫, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৪, ৬/৩১২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৬)

মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ
গোড়ান, ঢাকা

৩২৮ প্রশ্ন : বিগত পাঁচ-ছয় মাস আগে অ্যাক্সিডেন্টে আমার পা ভেঙ্গে যায়। আমি ২-৪ মাস পরে আমার পেনশনের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা পাবো। আমি

আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করেছিলাম এবং আমার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে আগামী বছর। এখন আমি কি এমন ভাঙ্গা পা নিয়েই আগামী বছর হজ্জে যাবো? এমতাবস্থায় কি আমার হজ্জের ফরয আদায় হবে, না পরবর্তীতে আমার পা ভালো হয়ে গেলে তখন যাবো? তখন হজ্জে গেলে কি কোন সমস্যা হবে বা বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবো? কোন সময়টাতে আমার জন্য হজ্জে যাওয়া উত্তম হবে? আর যদি এর মধ্যে আমি মারা যাই তাহলে আমার কী করণীয়? এই সকল ব্যাপারে মেহেরবানী করে একটা শরয়ী সিদ্ধান্ত দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : আগামী হজ্জের সর্বশেষ ফ্লাইটে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকতে থাকতেই যদি আপনি এ পরিমাণ সুস্থ হয়ে ওঠেন যে, হজ্জের কাজসমূহ একাকী আদায় করতে পারেন, তাহলে এ বছরই হজ্জ আদায় করা আপনার উপর ফরয হবে। আর যদি আপনি এ পরিমাণ সুস্থ না হন বা দীনদার অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতানুযায়ী এ অবস্থায় পায়ের উপর চাপ পড়লে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে বা মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আপনার উপর হজ্জে যাওয়া ফরয হবে না। বরং সুস্থ হলে হজ্জ আদায় করবেন। অবশ্য এর মধ্যে ইন্তেকালের আশঙ্কা হলে আপনার জন্য উত্তম হবে, বদলী হজ্জের ওসীয়ত করে যাওয়া। তবে এ পা-ভাঙ্গা অবস্থায়ও যদি আপনি অন্যের সহযোগিতা নিয়ে হুইল চেয়ারে হজ্জ আদায় করে নেন, তাহলে আপনার হজ্জের ফরয আদায় হয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান- ৯৭, কানযুদ দাকায়িক; পৃষ্ঠা ৭২, আল-বাহরুর রায়িক ২/৩৩৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২১৬, মানাসিকে মোল্লা আলী কারী; পৃষ্ঠা ৫৩, ফাতাওয়া শামী ২/৪৫৯, ইমদাদুল আহকাম ২/১০৬, ফাতাওয়া উসমানী ২/২০৭)

মুহাম্মাদ আলী
হাসান নগর, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

৩২৯ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ানো বাবদ লেনদেন নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। আমাদের খতীব সাহেব বলেন, তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেয়া বা দেয়া কোনটিই জায়েয নয়। কিন্তু হাফেয সাহেবরা বলেন, তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেয়া অবশ্যই জায়েয। এ নিয়ে এলাকায় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

মুফতী সাহেবের নিকট আকুল আবেদন, বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত সমাধান দিয়ে আমাদেরকে দীনের উপরে চলার জন্য সহযোগিতা করবেন।

উত্তর : আপনাদের খতীব সাহেবের কথাই সঠিক। তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেয়া বা দেয়া কোনটিই জায়েয নয়। সুতরাং যে সকল হাফেয সাহেব বলেছেন, তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেয়া অবশ্যই জায়েয, তাদের কথা ঠিক নয়।

তারাবীহ বাবদ হাফেয সাহেবদের জন্য চাঁদা উঠানোও শরীয়তে নিষেধ। এটা একটা শরীয়া পরিপন্থী কাজ। অনেকে তারাবীহর বিনিময় হালাল করার জন্য এ কথা বলে থাকে যে, মানুষ খুশি মনে হাফেয সাহেবদের হাদিয়া দেয়; তারাবীহর বিনিময় হিসেবে নয়, সুতরাং এটা জায়েয হবে। তাদের এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ যদি এটা খুশি মনে হাদিয়া হতো, তাহলে তারা রমাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে কেন দেয় না? আর তারাবীহ পড়ানো ব্যতীত কেন দেয় না?

আবার কেউ কেউ এই হিলা অবলম্বন করেন যে, যদি হাফেয সাহেবকে পাঁচ ওয়াক্ত বা তিন ওয়াক্ত নামাযের ইমাম বানিয়ে দেয়া হয় তাহলে তার জন্য টাকা নেয়া জায়েয হবে। কিন্তু এ হিলা সহীহ নয়। কেননা প্রত্যেক কাজ তার মাকসাদ হিসেবে সহীহ বা গলত হয়। এখানে যেহেতু ইমামতি মাকসাদ না; বরং তারাবীহর মধ্যে কুরআন শুনানো মাকসাদ এজন্য কুরআন শুনানোর মাকসাদই ধর্তব্য হবে। তাই দীনী ব্যাপারে এরূপ হিলা জায়েয নয়।

তবে হ্যাঁ, কেউ যদি হাফেয সাহেবকে তার দীনদারীর কারণে মহব্বত করেন, তাহলে মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ ব্যক্তিগতভাবে খতমের আগে বা পরে বা যে কোন সময় হাফেয সাহেবকে কিছু হাদিয়া পেশ করবেন।

তবে এটা খতমের দিন বা তারাবীহর শেষে না হওয়া কাম্য। যাতে স্পষ্ট হয় যে, এটা বাস্তবেই ব্যক্তিগত মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ হাদিয়া।

উল্লেখ্য, হাফেয সাহেবের থাকা-খাওয়ার খরচ এবং যদি যাতায়াত করে তারাবীহ পড়ায় তাহলে যাতায়াতের স্বাভাবিক খরচ মসজিদ কর্তৃপক্ষ বহন করবে। (সূরা বাকারা- ৪১, ফাতাওয়া শামী ২/৭৩, ৬/৫৫, ৫৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৪, রমাযান আওর জাদীদ মাসাইল; পৃষ্ঠা ২১৮)

সালিম হুসাইন
পশ্চিম তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

৩৩০ প্রশ্ন : (ক) আমাদের মসজিদটি মাঝারি আকারের। পূর্বে আমরা মিম্বরের সামনে মেঝেতে বসে তাবলীগের ইজতিমায়ী আমলগুলো পুরা করতাম। কয়েকজন মুসল্লীর ইনফিরাদী আমলে অসুবিধার কারণে মসজিদ কমিটি কিছুটা ডানে বা বামে সরে আমল করতে বলেন। সে অনুযায়ী আমরা আমল করে আসছিলাম।

একদিন মাগরিবের পর মসজিদের উত্তর পাশে বসে আমল শুরু করলাম। তখন দক্ষিণ পাশে মুসল্লীরা ইনফিরাদী আমল করছিলো, আর উত্তর দেয়াল ঘেঁষে ২/৩ জন ইনফিরাদী আমল করছিলো। এমতাবস্থায় একজন মুসল্লী বললেন, তোমাদেরকে না বলেছি একপাশে সরে গিয়ে আমল করতে! আমরা বললাম, যদি সে পাশেও ইনফিরাদী আমল চলে, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে আমল করবো? তখন তিনি বললেন, প্রয়োজন হলে মসজিদের বারান্দায় আমল করবে। আমরা বললাম, আমরা তো সুন্নাত নামায শেষে আমল শুরু করেছি। তখন তিনি বললেন, আমার আমল তো তোমাদের আমলের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এখন জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় আমরা শরীয়ত মোতাবেক মসজিদের কোথায় বসে আমল করতে পারি এবং ইনফিরাদী আমল কোথায় হতে পারে? আর একই সময়ে ইনফিরাদী ও ইজতিমায়ী আমলের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

(খ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একই সময়ে ইজতিমায়ী ও ইনফিরাদী আমলগুলো মসজিদে নববীর কোন স্থান থেকে হতো?

উত্তর : (ক) ইজতিমায়ী ও ইনফিরাদী উভয় আমলই গুরুত্বপূর্ণ। কোনটাকেই তুচ্ছ বা হালকা দৃষ্টিতে দেখার অবকাশ নেই। তবে ইনফিরাদী নফল আমলের চেয়ে ইজতিমায়ী আমলের গুরুত্ব অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও ইজতিমায়ী আমলকারীদের উচিত হলো, অন্যান্য নামাযীদের সুন্নাত পড়া শেষ হলে সামনের দিক থেকে তিন/চার কাতার ছেড়ে একপাশে গিয়ে আমল শুরু করা। আর ইনফিরাদী আমলকারীদেরও উচিত সুন্নাত শেষ করে নফল পড়তে চাইলে সামনে বা ইজতিমায়ী আমলের বিপরীত পাশে অথবা প্রয়োজনে বারান্দায় গিয়ে পড়া। আর সুযোগ হলে ইনফিরাদী আমলকারীদেরও নফল ও অন্যান্য আমল আগপিছ করে ইজতিমায়ী আমলে শরীক হওয়া। কেননা ইজতিমায়ী আমল যথা ফাযাইলের তা'লীম, গাশত, মশওয়ারা ইত্যাদির মাধ্যমে দীন মানার

আগ্রহ পয়দা হয় এবং মহল্লার প্রত্যেক মুসলমান যাতে নামাযী ও দীনদার হয়ে যায় সে অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তাই পূর্ব থেকে চলে আসা একটা ইজতিমায়ী আমল স্থানান্তর করে বারান্দায় নিয়ে যেতে হবে আর ইনফিরাদী আমল ভিতরেই করতে হবে এমনটা জরুরী নয়; বরং ব্যক্তিগত নফল নামায তো ঘরে পড়াই উত্তম। সুতরাং এমন বিষয় নিয়ে বিরোধ তৈরি করা উচিত নয়।

(খ) মসজিদে নববীতে সর্বদা বিভিন্ন আমল চালু থাকতো। যেমন তা'লীম-তা'আল্লুম তথা শেখা-শেখানো, দীনী মুযাকারা ইত্যাদি। আর এসব আমল মসজিদে নববীর কোন স্থানে হতো এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সাহাবীগণকে দীনী বিষয় সম্মিলিত কোন দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হলে তা মিম্বরের কাছে ডেকে নিয়েই প্রদান করতেন। (সূরা নূর- ৩৬, তাফসীরে মাযহারী ৬/৫৩৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/৯৫)

মুহাম্মাদ মাহফুযুল আলম
পশ্চিম তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

৩৩১ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে ঈশার নামাযের পর পূর্বে থেকেই তা'লীমের আমল চলে আসছে। এখন মসজিদ কমিটি ঈশার পরেই কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলে কোন স্থানে করা উচিত। উল্লেখ্য, আমাদের মসজিদটি মাঝারি আকারের।

কোন কোন মুসল্লী বলেন যে, কুরআনের তা'লীমের চেয়ে কিতাবী তা'লীমের গুরুত্ব কম, বিধায় কিতাবী তা'লীম অন্য সময় বা একই সময়ে হলে অন্য কোথাও বা অন্য তলায় হবে। এ কথাটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

উত্তর : কুরআন শরীফ শিক্ষা করা নিঃসন্দেহে এক বিরাট ফযীলতের কাজ। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে, কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০২৭)

অন্য সমস্ত যিকির-আযকার থেকে তা'লীমে কুরআনের ফযীলত অনেক বেশি। পক্ষান্তরে কিতাবী তা'লীমের আমলও একটি সওয়াব ও পূণ্যের কাজ। কেননা তাতে যিকির, তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং এটাও একটি দীনী গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই তা'লীমে কুরআন এবং কিতাবী তা'লীমের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করা যাবে না। বরং দুটোই দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে আপনাদের মসজিদটি যেহেতু মাঝারি আকারের, তাই একই সময়ে উভয় তা'লীমের প্রোগ্রাম না করে আগে-পরে করে উভয় তা'লীম চালানো যেতে পারে। আর উভয় তা'লীমেই সকলের অংশগ্রহণ করা উচিত। দুই তা'লীমের বিষয়ে মুসল্লীদের দুভাগে বিভক্তির কোন সুযোগ নেই। কেননা উভয় তা'লীম সকল মুসল্লীর জন্য জরুরী। তবে কুরআনের তা'লীম কুরআন সহীহ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। যাদের কুরআন তিলাওয়াত অশুদ্ধ এটার বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আর কিতাবী তা'লীম তো আজীবন চলতেই থাকবে। (সূরা আলে ইমরান- ১০৫, ১৬৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৫৬৪, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৯২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২১৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ২/৩৭৩, ফাতাওয়া কাসেমিয়্যাহ ৪/৪০০)

মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ
ধুনট, বগুড়া

৩৩২ প্রশ্ন : (ক) স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সহ্য করতে না পারে অথবা স্ত্রী তার স্বামীকে সহ্য করতে না পারে, তাহলে কি একে অপরের মধ্যে তাবীয-কবযের মাধ্যমে মহব্বত সৃষ্টি করতে পারবে?

(খ) কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য তাবীয-কবয করে তাহলে কি তদবীরের মাধ্যমে বিয়ে দেয়া যাবে?

(গ) আমেলের বা কবিরাজের জন্য এ সমস্ত তদবীর করা জায়েয আছে কি? কবিরাজের জন্য কি টাকা চেয়ে নেয়া জায়েয আছে?

উত্তর : (ক) কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কোন দু'আ কিংবা কুরআনের কোন আয়াতবিশেষ কোন বৈধ উদ্দেশ্যে পাঠ করলে কিংবা লিখে ব্যবহার করলে যদি উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়, অথবা কোন জায়েয উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কুরআনের কোন আয়াত বা কোন দু'আ লিখে তাবীয-কবয করা হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি তদবীরের মধ্যে শিরকী কোন কথা বা নাজায়েয কোন উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের তাবীয ব্যবহার করা হারাম হবে। সুতরাং বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর মহব্বত বৃদ্ধির জন্য কুরআনের কোন আয়াত কিংবা হাদীসের কোন দু'আ লিখে তাবীয করতে পারবে। (আহকামুল কুরআন ১/৫১, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/১৮৮, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৬৪, ৪২৯, ইমদাদুল আহকাম ১/৩৩২-৩৩৪)

(খ) বিবাহ শাদীতে ছেলে মেয়ে উভয়ের ইচ্ছা ও পছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা জরুরী। এজন্য এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা জায়েয নেই যে, অনিচ্ছায় ছেলে কিংবা মেয়ে একে অপরের প্রতি আশেক হয়ে বিবাহে প্রস্তুত হয়ে যায়। তবে ভালো কোন ছেলের সাথে বিবাহ হয়ে যাওয়ার জন্য জায়েয পন্থায় তাবীয-কবয করে তদবীর করা জায়েয হবে। (আহকামুল কুরআন ১/৫১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৮৯)

(গ) আমেলের জন্য কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীসে বর্ণিত কোন দু'আর মাধ্যমে কারো উপকার করার জন্য তদবীর করা জায়েয আছে। আর এর বিনিময় চেয়ে নেয়ারও অবকাশ রয়েছে। তবে বিনিময়টা স্বাভাবিক হতে হবে। অনেকে সামান্য মেহনত করে হাজার হাজার টাকা উসূল করে– এটা জায়েয নয়। আর এ কাজকে নিজের পেশা না বানানোই উত্তম। কিন্তু কাউকে ক্ষতি পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কিংবা কোন নাজায়েয পন্থায় বা কুফরী কালামের মাধ্যমে তদবীর করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। (শরহুন নাবাবী আলা মুসলিম ১৪/১৮৮, ফাতাওয়া শামী ৬/৫৭, আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ১৩/৩৪, কিতাবুন নাওয়াযিল ১২/৪৫১)

ইমরান হুসাইন
নীলফামারী

৩৩৩ প্রশ্ন : (ক) আমাদের এলাকার প্রচলিত রীতি হলো, কিছু লোক রাজশাহী বা সিলেটে ধান কাটতে যায় এবং তারা শ্রমের বিনিময়ে টাকা না নিয়ে ধান গ্রহণ করে। আর কিছু লোক, যারা নিজেরা ধান কাটতে যায় না, কিন্তু এই শ্রমিকদেরকে রাজশাহী/সিলেটে যাওয়ার আগে নির্ধারিত পরিমাণ (যেমন ২৫০০০/-) টাকা দেয়। এ টাকা শ্রমিকরা তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে। অতঃপর শ্রমিকরা সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাদের আহরিত ধানগুলো নিজেরা মাথাপিছু সমানহারে ভাগ করে নেয়। এক্ষেত্রে টাকাদাতারাও শ্রমিকদের সমপরিমাণ একভাগ ধান নেয় এবং নিজের প্রদত্ত উক্ত টাকা ফেরত নেয়।

জানার বিষয় হলো, এ পদ্ধতিতে টাকা দিয়ে ধানের সাথে পূর্ণ টাকা ফেরত নেয়া বৈধ কি না?

(খ) প্রতি বছর ঈদের দিনে ইজতিমায়ী-ভাবে কবর যিয়ারত করার বিধান কী?

ঈদুল আযহায় নামাযে যাওয়ার পূর্বে গুরুত্বের সাথে গরু-ছাগল গোসল করানোর বিধান কী?

উত্তর : (ক) প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে টাকার সাথে ধান নেয়া স্পষ্ট সুদ– যা হারাম। সুতরাং উক্ত লেনদেন জায়েয নয়। জায়েযভাবে করতে চাইলে 'বাইয়ে সলম' পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। বাইয়ে সলমের পদ্ধতি হলো, যারা ধান কাটতে যাবে তাদেরকে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা এ শর্তে প্রদান করবে যে, নির্ধারিত সময়ের পর তারা উক্ত টাকার পরিবর্তে নির্দিষ্ট প্রকার ও পরিমাণ ধান টাকা বিনিয়োগকারীকে প্রদান করবে; এক্ষেত্রে তারা ধানের সাথে কোন টাকা পাবে না। (সূরা নিসা- ২৯, আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী ৩/৬১, ৭০)

(খ) কবর যিয়ারত করা একটি উত্তম আমল। ফিকহের কিতাবসমূহে বরকতময় দিনগুলোতে কবর যিয়ারতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। সুতরাং ঈদের দিনে অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে সময় ও সুযোগ মত কবর যিয়ারত করে নিবে। ইজতিমায়ীভাবে আলাদা গুরুত্ব সহকারে জরুরী মনে করে করবে না।

তেমনিভাবে ঈদের দিনে অন্যান্য দিনের ন্যায় কোন মালিক তার গরু-ছাগলকে গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নিষেধ নেই। কিন্তু গুরুত্ব সহকারে বিশেষভাবে ঈদের দিনে নামাযের পূর্বে গরু-ছাগলকে গোসল করানো এবং এটাকে প্রথা বানিয়ে নেয়া ও সওয়াবের কাজ মনে করে করা জায়েয হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/২৪২, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৫০, আল-কওলুল মুবীন ফী আখতা-ইল মুসাল্লীন; পৃষ্ঠা ২৯৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/২০১, ১১/৪৪)

মুবারক কারীম
মোমেনশাহী

৩৩৪ প্রশ্ন : (ক) আমার এক নিকটাত্মীয় যিনি সারা জীবন ব্যাংকে চাকরী করেছেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। কর্মজীবনে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত আয়ে শহরে বাসাবাড়ি নির্মাণ করেছেন। এছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তার কিছু জমিও আছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ তুলনামূলক কম। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্র ও ভবিষ্যতে নিয়মিত নগদ অর্থ দিতে চাচ্ছেন। আর আমি একজন গরীব তালিবুল ইলম। সুতরাং তার অধিকাংশ উপার্জন হারাম জানা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করার বিধান কী?

বি.দ্র. তিনি আমাকে অত্যধিক মহব্বত করেন। তার দেয়া হাদিয়া ও নগদ অর্থ গ্রহণ না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং তার অর্থ গ্রহণ করা যদি হারাম হয় তাহলে তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায় কী হতে পারে? জানানোর অনুরোধ রইল।

(খ) মোবাইলে ছোট মেয়েদের ভিডিও বা অডিও গজল শোনার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : (ক) প্রশ্নের বর্ণনা মতে আপনার আত্মীয়ের যেহেতু অধিকাংশ সম্পদই হারাম, তাই আপনার জন্য উক্ত আত্মীয়ের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না; চাই এতে তিনি অসন্তুষ্টই হোন না কেন। তবে আপনার আত্মীয় যদি সুদ থেকে দায়মুক্তির জন্য সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে এবং আপনি বাস্তবেই যদি গরীব (যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত) হন, তাহলে আপনার জন্য উক্ত আত্মীয়ের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে। তাই আপনি নিজে বা অন্য কারো মাধ্যমে আপনার আত্মীয়কে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারেন।

তবে তিনি যদি নির্দিষ্ট করে কোন সম্পদের ব্যাপারে বলেন যে, এটা হালাল, আমি ওয়ারিশসূত্রে এর মালিক হয়েছি বা ঋণ নিয়েছি ইত্যাদি, তাহলে আপনার জন্য উক্ত হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে। (সূরা বাকারা- ২৭৮, আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ১২৮, ১৩৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৪৩, তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৬৬, ফাতাওয়া শামী ৫/৯৯, কিতাবুন নাওয়াযিল ১১/৩৬৫, ফাতাওয়া কাসিমিয়্যা ২৪/২৩০)

(খ) উপমহাদেশের অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরামের মতে বর্তমানে প্রচলিত ডিজিটাল পিকচার ও ভিডিও শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবির অন্তর্ভুক্ত– তাই এগুলো নাজায়েয। সুতরাং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ কোন বিষয় নয়; বরং যে কোন প্রাণীর ভিডিও দেখা নাজায়েয। চাই তা গজলের ভিডিও হোক বা অন্য কোন কিছুর। তবে শরয়ী প্রয়োজন ভিন্ন বিষয়। আর ছোট অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের কণ্ঠে ভিডিও ছাড়া শুধু অডিও ইসলামী গজল শ্রবণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৯২, ৫৯৫০, আল-বাহরুর রায়িক ২/২৯, চান্দ আহাম আসরী মাসাইল ১/৩৪৩, ফাতাওয়া উসমানী ৪/৩৭৯)

মুহাম্মাদ সুহাইল
নরসিংদী

৩৩৫ প্রশ্ন : জনৈক নারীর দীর্ঘদিন যাবৎ কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি তার আপন বড় বোনের দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে এনে প্রতিপালন করতে থাকে। বড় বোনও ছোট বোনের দাম্পত্য জীবনে সুখের জন্য আপন মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে সন্তানটিকে দিয়ে দেয়।

বর্তমানে ছেলেটির বয়স ৪ থেকে ৫ বছর। এখন ছোট বোনের স্বামী তাকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য নিজেদের নামে ছেলেটির জন্মসনদ বানিয়েছে। সাথে সাথে স্ত্রীর বড় বোনও তার স্বামীকে একটি স্ট্যাম্পের মাধ্যমে ছেলেটিকে সম্পূর্ণরূপে দিয়ে দেয়ার শর্তে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেন। অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ছোট বোনের স্বামী বলেছেন, আমি লালন-পালন করতে থাকি। বড় হওয়ার পর যদি সে আমাদের রেখে চলে যায়, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। বিষয়টি বড় বোনও মেনে নেয়। অতএব এক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং বর্তমানে ছেলেটিকে নিয়ে তাদের করণীয় কী? অবহিত করলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : বাবা-মা সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলে তাদের সন্তান অন্যের জন্য লালন-পালন করা জায়েয আছে। তবে সন্তানকে তার আসল পিতা-মাতার পরিচয় জানাতে হবে এবং তাদের পরিচয়ে পরিচিত করতে হবে। আসল পিতা-মাতার স্থানে অন্য কেউ তার পিতা-মাতা হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে না। কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং বাচ্চার জন্মসনদসহ যাবতীয় কাগজপত্রে তার আসল পিতা-মাতার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায়ও কেউ তার পরিচয় জানতে চাইলে তার আসল পিতার নামই বলতে হবে। প্রতিপালনকারী দম্পতি নিজেদেরকে তার পিতা-মাতা হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে বাচ্চাটি বড় হলে তার জন্যও তার আসল পিতা-মাতার পরিবর্তে প্রতিপালনকারীদেরকে পিতা-মাতা হিসেবে পরিচয় দেয়া জায়েয হবে না এবং প্রতিপালনকারীগণ তার মাহরাম না হয়ে থাকলে তাদের সাথে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে।

অতএব প্রশ্নোক্ত ঘটনায় ছেলেটিকে স্থায়ীভাবে দিয়ে দেয়ার জন্য স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করতে চাপ প্রয়োগ করা অন্যায় হয়েছে এবং পিতা-মাতা অস্বীকার করে যথাযথ কাজ করেছেন। অনুরূপভাবে খালা-খালু নিজেদের নামে ছেলেটির যে জন্মসনদ বানিয়েছে, সেটাও ঠিক হয়নি। অনতিবিলম্বে তা বাতিল করে তার আসল পিতা-মাতার নাম দিয়ে নতুনভাবে জন্মসনদ বানাতে হবে। (সূরা

মুজাদালাহ- ২, সূরা আহযাব- ৪-৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৫০৮, ৩৫০৯, ৪৭৮২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৬১, ৬২, ৬৩, ২৪২৫, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৭৬-৩৭৮)

মুহাম্মাদ হাসান আহমাদ
মোমেনশাহী

৩৩৬ প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ নেয়ার যে প্রথা চালু আছে অর্থাৎ ব্যাংক থেকে নিজস্ব ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত এক মাসের জন্য নেয়া যায়। তারপর এক মাসের মধ্যেই সে টাকা পরিশোধ করতে হয়। পাশাপাশি ১৭৫/- (একশত পঁচাত্তর) টাকা অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয়। আর যদি মাস শেষ হলেও আদায় না করে তাহলে মাস প্রতি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।

প্রশ্ন হলো, ১৭৫/- (একশত পঁচাত্তর) টাকা অতিরিক্ত চার্জ আদায় করে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কি ঋণ নেয়া যাবে?

আর এক মাসের পর যে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়, তা আদায়ের বৈধতা কতটুকু? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

বি.দ্র. এ সুবিধা দিতে গিয়ে তাদের এ.টি.এম. বুথ পাহারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন খরচ হয়ে থাকে, সেজন্য তারা এ অতিরিক্ত ১৭৫/- (একশত পঁচাত্তর) টাকা খরচ নিয়ে থাকে।

উত্তর : ক্রেডিট কার্ডে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ না করলে সুদ আদায়ের শর্ত থাকে। কাজেই এর অধীনে একটি সুদী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। অবশ্য অতিরিক্ত ১৭৫/- (একশত পঁচাত্তর) টাকা এটি সার্ভিস চার্জ, যা ঋণ না নিলেও পরিশোধযোগ্য। সুতরাং এ অংশ জায়েয।

আর এক মাসের পর যে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা ধার্য করা হয় তা সম্পূর্ণ সুদ। তা আদায় করা হারাম। মোটকথা, ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে জায়েয-নাজায়েয উভয়টির সংমিশ্রণ রয়েছে। সুতরাং পারতপক্ষে তা ব্যবহার না করাই নিরাপদ। আর যদি প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে এর জন্য শর্ত হলো, নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই ঋণ আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া; কোনভাবেই যাতে এ কার্ড ব্যবহারকারীর উপর সুদ না আসে সে ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখা। (দিরাসাতুল মা'আইরিশ শারঈয়্যা ১/১৮৭-১৮৯, ১৯৭-১৯৮, মাজাল্লাতু মাজমাঈল ফিকহিল ইসলামী ১০/১০৯৬, ১১৩৭; শামেলা সংস্করণ, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৫২-৩৫৩)

আবূ আব্দুল্লাহ যাকওয়ান
যশোর

৩৩৭ প্রশ্ন : (ক) সরকার থেকে এলাকার উন্নয়নের জন্য যে অর্থ চেয়ারম্যান বা মেম্বারকে দেয়া হয়, কাজ করার পর অতিরিক্ত টাকা নিজেরা নিতে পারবে, নাকি সরকারকে ফেরত দিতে হবে?

(খ) গরুর ব্যবসা করার বিধান কী? অনেকে এ ব্যবসাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে, অথচ সেটাও একটা ব্যবসা।

উত্তর : (ক) সরকারের পক্ষ থেকে যে টাকা-পয়সা এলাকার উন্নয়নের জন্য চেয়ারম্যান বা মেম্বারকে দেয়া হয় তা কেবলমাত্র উন্নয়নের কাজেই ব্যয় করতে হবে। কাজ করার পর অবশিষ্ট টাকা সরকারকে ফেরত দিতে হবে, অথবা জনগণের উন্নয়নমূলক কোন কাজে খরচ করতে হবে; চেয়ারম্যান বা মেম্বারের জন্য তা ভোগ করা জায়েয হবে না। (সূরা নিসা- ৫৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৩, তাফসীরে বাগাবী ১/৬০২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৭/২৮০)

(খ) শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে যে কোন বৈধ ব্যবসা করতে কোন অসুবিধা নেই। গরুর ব্যবসাও একটা বৈধ ব্যবসা; একে খারাপভাবে নেয়ার কিছুই নেই। (সূরা বাকারা-২৭৫, তাফসীরে বায়ান ২/১৪৮, আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস ৩/১৩১, আহকামুল কুরআন লি-ইবনিল ফারাস ১/৪০৪)

মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন

৩৩৮ প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে ইটের ভাটায় অগ্রীম টাকা নিয়ে ইট বিক্রয় করা হয়। এ নিয়মে চলতি বছর এক হাজার ইটের বিক্রয় মূল্য ৬,৮০০/- (ছয় হাজার আটশত) টাকা ধরে ভাটা কর্তৃপক্ষ টাকা গ্রহণ করেছেন। গ্রামের অনেকেই এখানে ব্যবসার নিয়তে টাকা বিনিয়োগ করেন। ভাটা কর্তৃপক্ষ অনেক সময় ইট না দিয়ে ক্রেতাকে লাভের টাকাসহ মূল টাকা ফেরত দেয় এ নিয়মে যে, সিজনের প্রথম, মাঝ ও শেষ তিন সময়ের বিক্রয় মূল্যের গড় হিসাব করে ইট বিক্রয় বাবদ ভাটার একটা খরচ বাদ দিয়ে যে লাভ আসে তা প্রদান করেন। তাতে মোটামুটি প্রতি হাজার ইটের উপর বারো/তেরো'শ টাকা করে লভ্যাংশ গত বছর প্রদান করেছেন।

আমি সেখানে কিছু টাকা বিনিয়োগ করতে চাই। তাই ভাটা কর্তৃপক্ষকে আমি বলেছি, যেদিন আমাকে ইটের মূল্য ফেরত দেয়া হবে, সেদিন ভাটায় ইট যে মূল্যে বিক্রয় করা হবে, সে মূল্য হিসেব করে ভাটার বিক্রয় খরচ বাদ দিয়ে যে মূল্য আসে সে হিসেবে আমাকে টাকা দিতে হবে।

জানার বিষয় হলো, এ নিয়মে ব্যবসা করা জায়েয হবে কিনা? জায়েয না হলে শরীয়তে এভাবে অগ্রীম টাকা দিয়ে ব্যবসা করার বিধান কী? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী ভাটায় ইট ক্রয় বাবদ টাকা দিয়ে পরবর্তীতে ইট গ্রহণ না করে কথিত লাভসহ মূল টাকা গ্রহণ করা জায়েয নেই। এটা এক ধরনের সুদী কারবার। শরীয়তের পরিভাষায় এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে বাইয়ে সলম (তথা বাকি পণ্যের বিনিময়ে নগদ মূল্য প্রদান করা) বলে । এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি শর্ত হলো, ক্রেতা বিক্রিত পণ্য নিজের আয়ত্বে না এনে অন্যত্র বিক্রয় করতে পারবে না। অথচ প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক ইট বুঝে নেয়ার কোন প্রসঙ্গই নেই। তবে আপনি যদি ভাটার মালিক হতে ইট নিজের আয়ত্বে নেয়ার পর বিক্রি করেন তাহলে বৈধ হবে। তাছাড়া ইট হস্তান্তরের তারিখও সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। অন্যথায় চুক্তিটি শুরুতেই সহীহ হবে না। (মাজমাউল আনহুর ২/১০৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০০০২, বাদায়িউস সানায়ে' ৭/১৫৩, ফাতাওয়া শামী ৫/২০৯, ২১৮, ফিকহুল বুয়ূ' ১/৫৮৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৯/৩৪৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৭০, কিতাবুন নাওয়াযিল ১১/৬১)

মুহাম্মাদ আহমাদ আব্দুল্লাহ
বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৩৩৯ প্রশ্ন : (ক) বর্তমানে আমাদের দেশে যে সকল মহিলা মাদরাসা আছে এগুলো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? এবং কোন পুরুষের জন্য মহিলা মাদরাসায় খিদমতের ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত কী?

(খ) কুড়িয়ে পাওয়া টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু মসজিদ বা মাদরাসায় দান করা যাবে কিনা? যদি না যায় তাহলে তা কী করবে?

উত্তর : (ক) এক. নারী-পুরুষ সকলের জন্য দীনের জরুরী পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরয। এ ফরয পরিমাণ ইলম মেয়েরা ঘরে অবস্থান করে মাহরাম থেকে অর্জন করবে। এ পদ্ধতিতে মেয়েদের ইলমে দীন শিক্ষাগ্রহণ ইসলামের শুরু যামানা থেকেই চলে আসছে। এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। আর

যদি দীন শেখানোর মতো কোন মাহরাম না থাকে, তাহলে মহল্লাবাসী মিলে মকতব প্রতিষ্ঠা করে কোন দীনদার-পরহেযগার মহিলার মাধ্যমে পূর্ণ পর্দাসহ এলাকার মেয়েদের অনাবাসিকভাবে দীনী ইলম শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। যেন অভিভাবকগণ সহজেই নেগরানী ও দেখাশোনা করতে পারেন।

আর বর্তমানে প্রচলিত আবাসিক মহিলা মাদরাসার সিলসিলা যদিও ইসলামের শুরু যামানায় ছিলো না, তথাপি বর্তমানে এর প্রয়োজন অনুভব করে মুফতিয়ানে কেরাম আবাসিক মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা কিছু শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলে থাকেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ–

১. পর্দার পূর্ণ পাবন্দী করাতে হবে– বিশেষ করে মাদরাসায় আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে।

২. মাদরাসার কোন স্টাফের সাথে শিক্ষার্থীদের কোন ধরনের সম্পর্কের সুযোগ না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. মাদরাসার শিক্ষক যথাসাধ্য পরহেযগার মহিলা হতে হবে। কোন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হলে পরিণত বয়সের পরহেযগার আলেমকে নিয়োগ দিতে হবে।

৪. মাদরাসার নেসাব কোন নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে।

৫. তা'লীমের সাথে তরবিয়তের গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাহরাম মহিলাদের দ্বারাই মাদরাসার নেযাম চালাবে।

৭. শিক্ষা সিলেবাসে মহিলাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি বেশি থাকতে হবে।

৮. আবাসিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সিলেবাস এতটুকু নাতিদীর্ঘ হওয়া উচিত যেন মেয়েরা পারতপক্ষে বালেগা হওয়ার পূর্বেই নেসাব শেষ করে নিতে পারে।

৯. প্রয়োজন মিটে গেলে আবাসিককে অনাবাসিক করার চেষ্টা করবে।

১০. মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পূর্ণ পরহেযগার হতে হবে। যেন মাদরাসাটি শিক্ষার নামে ব্যবসা আর মাতৃজাতির মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য নষ্ট করার কারখানায় পরিণত না হয়।

দুই. মহিলা মাদরাসার খিদমত পরহেযগার মহিলা করবে। অযীফার বিষয়টা উল্লেখ করা উচিত। এমন হতে পারে– শিক্ষিকার জন্য চলমান হার অনুপাতে অযীফা নির্ধারিত করতে হবে। অতি নগণ্য অযীফার যে প্রথা মহিলা মাদরাসায় চলমান তা থেকে সরে আসতে হবে। আর পুরুষ মাদরাসার খিদমত পুরুষ করবে। এছাড়া পুরুষের জন্য শিশু মেয়েদেরকে পড়াতে কোন সমস্যা নেই। আর সেয়ানা ও বালেগা মেয়েদের পড়ানোর ক্ষেত্রে যদি কোন পুরুষ নিজেকে ফিতনার আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে পারে এবং সে পরহেযগার ও মুত্তাকী হয়, তাহলে পর্দার আড়ালে থেকে শিক্ষকতা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হতে পারে। (সূরা আহযাব-৩৩, কিতাবুন নাওয়াযিল ১৪/২৪৬-২৪৯, কিফায়াতুল মুফতী ২/৩৫, মাদারিস; পৃষ্ঠা ৪২৬)

(খ) টাকা পয়সা বা অন্য কোন জিনিস যদি কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজের কাছে হেফাযত করবে। দীর্ঘদিন জনসমক্ষে ঘোষণা করার পরও যদি মালিক খুঁজে পাওয়া না যায় কিংবা টাকার পরিমাণ কম হওয়ায় এর মালিক আর কোনদিন আসবে বলেও মনে না হয়, তাহলে নিজে গরীব হলে ব্যবহার করতে পারবে। অন্যথায় যাকাত গ্রহণযোগ্য কোন ফকীরকে সদকা করে দিবে মূল মালিককে সওয়াব পৌঁছানোর লক্ষ্যে। ইচ্ছা করলে মাদরাসার লিল্লাহ তহবিলেও সদকা করতে পারবে; কিন্তু মসজিদে সদকা করতে পারবে না। কারণ মসজিদকে মালিক বানানো যায় না। সদকা করার পর যদি মালিক এসে উপস্থিত হয় এবং সদকার ব্যাপারে রাজি না হয়, তাহলে নিজের পক্ষ থেকে পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। (আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী ২/৪১৭, ৪১৮, আল-বাহরুর রায়িক ৫/১৬৫, ফাতাওয়া শামী ৪/২৭৮, ২৭৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৩৬৭)

মাসুম বিল্লাহ আকন্দ
নরসিংদী

৩৪০ প্রশ্ন : ১৯৭১-এ দেশ বিভক্তির সময় দুই হিন্দু সহোদরা ভারত চলে যান। যাওয়ার সময় এদের একজন নিজের স্থাবর সম্পত্তিগুলো স্থানীয় এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে যান। আর অপরজন বিক্রয় না করেই ফেলে রেখে চলে যান। পরবর্তীতে যে ব্যক্তি এক বোনের অংশ ক্রয় করে রেখেছিলো, সে অপর বোনের ফেলে যাওয়া জমিটুকু দখল করে নেয় এবং একটা জাল দলীলও তৈরি করে নেয়।

জানার বিষয় হলো, যার অংশটুকু সে ক্রয় করেনি; বরং দখল করেছে, সে অংশটুকুতে কি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে? হয়ে থাকলে কীভাবে? আর না হয়ে থাকলে এখন তার করণীয় কী? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে ঐ ব্যক্তি যে অংশটুকু ক্রয় করেনি শরীয়তের দৃষ্টিতে সে অংশটুকুতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। কারণ, হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পদের মালিক এ দেশের সরকার। সুতরাং এখন করণীয় হলো, তা সরকারের নিকট থেকে বৈধ উপায়ে গ্রহণ করা; অন্যথায় সরকারি ভূমি-অফিসে হস্তান্তর করা। (আল-লুবাব ফী শরহিল কিতাব ৪/১৫৩, ফাতাওয়া শামী ৪/১৩৮, ২১৭, দুরারুল হুক্কাম ১/৩০০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৪৬১)

মুন্সী আলী ফয়সাল

৩৪১ প্রশ্ন : আমরা স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন দু'টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। আমাদের দু'জনের কোম্পানীরই চিকিৎসা বিল দেয়ার সুযোগ আছে। কিছুদিন আগে আমাদের সন্তান হয়। এখন আমরা কি দু'জনই আমাদের নিজ নিজ কোম্পানীতে মেডিকেল বিল করতে পারবো?

উত্তর : একই বিল দুই কোম্পানী থেকে নেয়া যাবে না; বরং হয় যে কোন এক কোম্পানী থেকে পূর্ণ বিল নিবেন, না হয় অর্ধেক অর্ধেক করে দুই কোম্পানী থেকে নিবেন।

উল্লেখ্য, ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের যিম্মাদারী ও দায়িত্ব পৃথকভাবে বণ্টন করে দিয়েছে। বাইরের সকল দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত, আর আভ্যন্তরীণ দায়িত্বগুলো স্ত্রীর উপর অর্পিত। নারীদের জন্য যথাসম্ভব ঘরে অবস্থান আবশ্যক। বেগানা পুরুষদের সঙ্গে উঠা-বসা করতে হয় এমন যে কোন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকা জরুরী। শরীয়তের এ মূলনীতির আলোকে নারীদের জন্য বেগানা পুরুষের সাথে চাকুরী করা একেবারেই নাজায়েয কাজ। এর দ্বারা পর্দা যা শি'আরে ইসলাম এবং একটি ফরয আমল পালন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া এতে আরো বিভিন্নভাবে শরয়ী আহকাম লঙ্ঘিত হয়।

জীবন-জীবিকার জন্য ঠেকাবশত নারীকেও রোযগার করতে হলে তা করতে হবে সম্পূর্ণ নারী মহলে ও ঘরোয়া পরিবেশে। কেউ পরহেযগারীর সাথে চলতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা তার চলার পথকে সহজ করে দেন। (সূরা আহযাব- ৩৩, শরহু মা'আনিল আসার ৪/৯০, আউনুল মা'বূদ ওয়া হাশিয়াতু ইবনিল কায়্যিম ১০/১৫৭, ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলামিয়্যা ১২/২১৮৯, ৪৭৮৬, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৭০, দুরারুল হুক্কাম ২/৩০২)

কিশোর প্রতিভা

কোন পথে সমাজ!

রাত ৮টা। ব্যস্ত সড়কের পাশে অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি বাসের প্রতীক্ষায়। কনকনে শীতে জমে যাওয়ার দশা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। চলন্ত প্রাইভেটকার থেকে ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা মেয়ে। চমকে উঠে দু'হাত পিছিয়ে গেলাম। সাথে সাথে গাড়ি থেকে মাঝবয়সী দু'জন লোক বেরিয়ে এসে মেয়েটিকে টেনে তুলল। ছুটে চলা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় মেয়েটার পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাসায় ফেরার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। আমার প্রশ্নবিদ্ধ মন কোন সদুত্তর পাচ্ছিল না। গাড়ির চালককে পাশে ডেকে প্রশ্ন করতেই গড়গড় করে সব বলে দিল– 'ছোট মেমসাব (আহত মেয়েটা) বাংলাদেশের একজন নামকরা বিল্ডার্সের মালিকের মেয়ে। খারাপ ছেলে-মেয়েদের সাথে ওঠাবসা করে ড্রাগ এডিক্টেড (মাদকাসক্ত) হয়ে পড়েছে। তাই তাকে চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্যার আর ম্যাডাম ব্যস্ত, তাই স্যারের দুই ভাই নিয়ে এসেছে। ছোটমেম যেতে চাচ্ছে না বিধায় গাড়ি থেকে লাফ দিয়েছে।' এতটুকু বলতেই ড্রাইভারের ডাক পড়ল। গাড়িটা পূর্বদিকের রাস্তা ধরে সোজা মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালের দিকে চলে গেল। একগাদা প্রশ্ন এসে ভিড় করল মনের আঙিনায়।

একি অবস্থা আমাদের সমাজের? মাদকের সয়লাবে ভেঙ্গে পড়তে চলেছে আমাদের সমাজ! আছে কি এর কোনো প্রতিকার? তবে সরকারকে সাধুবাদ জানাতে হয়, ২০১৮-এর শেষের দিকে মাদকের বিরুদ্ধে তারা বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল। যদিও এখন তা আবার ঝিমিয়ে গেছে।

উঠতি বয়েসের ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে দুটো জিনিস পেলে বিপথগামী হবেই। এক. বল্গাহীন স্বাধীনতা। দুই. বেহিসাব টাকা-পয়সা। সেই সাথে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি তাদের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখে, তাহলে তো ধ্বংস অনিবার্য। আজকাল বড় বড় কলেজ-ভার্সিটিকেন্দ্রিক মদ-গাঁজা-ইয়াবার সিন্ডিকেট গড়ে ওঠার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে! শিক্ষকরাও এই সিন্ডিকেটের কাছে অসহায়। ভেবে আবাক হই, এই ছেলে-মেয়েরাই নাকি আগামীতে দেশ ও জাতির কাণ্ডারি হবে। এদের হাতেই নাকি নিরাপদ থাকবে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং এরাই নাকি আগামীর সূর্যসন্তান! আশ্চর্য হই! যৌবনের ঝড়-ঝাপ্টার সামনেই যে কিনা নিজেকেই ধরে রাখতে পারছে না, সে কি করে জীবন-জাহাযের হাল ধরবে? এবং যে কিনা তার যৌবনের বড় একটা অংশ কাটিয়েছে অন্ধকারের বাসিন্দা হয়ে, সে কিভাবে কর্মজীবনে অন্যদেরকে নিয়ে আসবে আলোর পথে?

আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকর আদায় করছি, তিনি অশেষ অনুগ্রহে যুগের এসব আপদ ও বিপদ থেকে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের হেফাযত করেছেন। বস্তুত আল্লাহই প্রকৃত হেফাযতের মালিক।

যুবাইর হাসান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

অন্যরকম আতিথেয়তা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী। আবূ তালহা আল-আনসারী রাযি.। খুব অতিথিপরায়ণ। একবারের ঘটনা। নবীজীর কাছে একজন মেহমান আসল। মেহমানদারির দায়িত্ব নিলেন প্রিয় সাহাবী আবূ তালহা। রাতের বেলা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মেহমান ও মেযবান এগিয়ে চলছেন। মেযবানের মনে খুশির ঢেউ। মেহমানদারির সুযোগ পেয়ে যারপর নাই খুশি! আর কেনই বা হবেন না? তিনি তো আজ সৌভাগ্যবান! নবীজীর মুখে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।' তিনি আজ সেই অমূল্য রতন কুঁড়িয়ে পেয়েছেন, যার বিনিময়ে আল্লাহ খুশি হবেন এবং খুশি হবেন নবীজীও। আর এই দু'জন খুশি হলে তো সোজা জান্নাত!

একটু পর। আবূ তালহা রাযি. মেহমানসহ বাড়িতে পৌঁছলেন। দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আওয়াজ আসল–কে?

–আবূ তালহা।

–সাথে আর কেউ?

–নবীজীর মেহমান।

স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাযি. খুশিখুশি দরজা খুলে দিলেন।

ভেতরে প্রবেশ করলেন মেহমান-মেজবান। আবূ তালহা প্রিয়তমা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে খাবার আছে?

–আছে, তবে অল্প।

–কী পরিমাণ?

–এই যে, শুধু বাচ্চাদের খাবার!

আবূ তালহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই সামান্য খাবারে কী হবে? বাচ্চা দুটি এখনো ভুখা। আবার মেহমানকে নিয়ে আসলাম। আচ্ছা! আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই খেলাম না। বাচ্চারাও না। খাওয়াবো শুধু মেহমানকে। কিন্তু সমস্যা তো অন্যখানে, মেহমানের সাথে তো আমাকেও বসতে হবে। না হয় মেহমান খাবেন না। আর আমি তার সাথে খেলে তিনি তৃপ্ত হতে পারবেন না। খাবার তো মাত্র একজনের। এসব রকমারি ভাবনা তার মাথায় উঠানামা করছিল। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হঠাৎ তার মাথায় চমৎকার একটা বুদ্ধি খুলে গেল।

–উম্মে সুলাইম!

–জ্বী, বলুন!

–একটা বুদ্ধি এসেছে।

–কী?

–আমি যখন মেহমানের সঙ্গে খেতে বসবো, তখনি তুমি বাতির কাছে যাবে।

–কী করব তখন?

–সলতে ঠিক করার বাহানায় বাতিটি নিভিয়ে দেবে। অন্ধকারে মেহমানই শুধু খেয়ে যাবেন। আর আমিও হাত-মুখ নেড়ে খাওয়ার বাহানা করে যাব।

– দারুণ তো!

মেহমানের সামনে দস্তরখান বিছানো হলো। পরিবেশিত হলো ওই সামন্য খাবার। মেযবান আবূ তালহাও বসলেন দস্তরখানে। যেই না খেতে শুরু করবেন, অমনি উম্মে সুলাইম নিখুঁতভাবে তার কাজটি সেরে ফেললেন। অন্ধকারে ছেয়ে গেল সারাঘর। এদিকে মেহমান স্বাভাবিক গতিতে খাচ্ছিলেন। আর মেযবান আবূ তালহা হাত নাড়াচাড়া করছিলেন। মেহমান ভাবছিলেন মেযবান তো তার মতই খাচ্ছেন। অথচ...। যাই হোক, মেহমানও পরিতুষ্ট হলেন। ওদিকে পুরো পরিবার সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। মেহমানকে ঘূণাক্ষরেও তা বুঝতে দিলেন না। পরদিন আবূ তালহা নবীজীর দরবারে হাজির। তার চেহারা আগের মতোই হাস্যোজ্জ্বল। অনাহারে কোনও ছাপ নেই। তিনি ভেবেছিলেন নবীজী হয়তো জানবেন না। কিন্তু তাকে তো ওহীর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই...। নবীজী তার কাছে পুরো ঘটনা সবিস্তার জানতে চাইলেন। এবার আর লুকিয়ে রাখার সুযোগ নেই। আবূ তালহা পুরো ঘটনা খুলে বললেন। নবীজী দারুণ খুশি হলেন। খুশি হলেন আল্লাহও। এমনকি তার ব্যাপারে নাযিল হলো একখানা আয়াত, যার অর্থ : আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা অভাবগ্রস্ত হয়।'

উবায়দুল্লাহ তাসনিম
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।